KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication : ১১৪নং বেনিয়াটোলা লেন, কল-৯
Collection : KLMLGK	Publisher : তরুণ চন্দ্র মিত্র
Title : চিত্র	Size : 7.25" x 9.5" 18.41 X 24.13 c.m. ①
Vol. & Number : 1/2 2/3 3/1 3/2 3/3	Year of Publication : শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৫৫ কার্তিক-পৌষ, ১৩৫৭ বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৫৮ শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৫৮ কার্তিক-পৌষ, ১৩৫৮
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : সুহাস চন্দ্র মিত্র	Remarks :

CD Roll No. : KLMLGK

চিত্ত

মনোবিদ্যাবিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা

সম্পাদক
সুহৃৎচন্দ্র মিত্র

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

ভারতীয় মনঃসমীক্ষা সমিতি কর্তৃক পরিচালিত

তৃতীয় বর্ষ বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬৮ প্রথম সংখ্যা

চিত্ত

সম্পাদক— সুহৃৎচন্দ্র মিত্র, এম.এ., পিএইচ.ডি.

সহসম্পাদক— তরুণচন্দ্র সিংহ, ডি. এস্‌সি.
সমীরকুমার বসু, এম.এ.

সম্পাদক পর্ষৎ— সুহৃৎচন্দ্র মিত্র, এম.এ., পিএইচ.ডি.
তরুণচন্দ্র সিংহ, ডি.এস্‌সি.
নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, এম.এস্‌সি., এম.বি.বি.এস.
নগেন্দ্রনাথ দে, এম.বি., এম.আর.সি.পি., ডি.পি.এম. ডি.টি.এম্.
জ্ঞানেন্দ্র দাসগুপ্ত, এম.এ., পিএইচ.ডি.

সহযোগিবৃন্দ— শ্রীমতী কনক মজুমদার, এম.এস্‌সি.
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
বিজয়কেতু বসু, বি.এস্‌সি., এম.বি.বি.এস.
শ্রীমতী স্বপ্না দে, এম.এস্‌সি.
হিরন্ময় ঘোষাল
শ্রীমতী অরুণা হালদার, এম.এ., ডি.ফিল.
শীতাংশু চট্টোপাধ্যায়
রমেশ দাশ, এম.এ., পিএইচ.ডি.
অরুণ ভট্টাচার্য
সজনীকান্ত দাস

পরিচালক সমিতি— সুহৃৎচন্দ্র মিত্র, এম.এ., পিএইচ.ডি.
তরুণচন্দ্র সিংহ, ডি.এস্‌সি.
নগেন্দ্রনাথ দে, এম.বি., এম.আর.সি.পি., ডি.পি.এম., ডি.টি.এম.
নির্মলকুমার বসু, এম.এস্‌সি.
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, এম.এ., এল.এল.বি.
নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, এম.এস্‌সি., এম.বি.বি.এস.
সমীরকুমার বসু, এম.এ.
এম. ভি. অমৃত
জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত, এম.এ., পিএইচ.ডি.
প্রমদানাথ চৌবে, এম.এ.
অনাদিনাথ ঘোষাল, এম.এ., এম.বি.বি.এস.
তড়িৎকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম.এ.
রমেশচন্দ্র দাস, পিএইচ.ডি.

চিত্ত

নিয়মাবলী

১। "চিত্ত" ত্রৈমাসিক পত্রিকা। বাংলা সনের বৈশাখ, শ্রাবণ, কার্তিক ও মাঘ মাসে প্রকাশিত হয়। প্রকাশের পরবর্তী মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে ডাকঘরে খবর লইয়া জবাব সহ জানাইতে হইবে।

২। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে।

৩। প্রবন্ধাদি মনোনয়নের ভার সম্পাদকের উপর থাকিবে।

৪। সম্পাদক প্রয়োজন বোধ করিলে প্রবন্ধাদির আবশ্যক পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংশোধন বা বিশেষ অংশ বাদ দিতে পারিবেন।

৫। এই পত্রিকার প্রকাশিত লেখা অন্য পত্রিকায় বা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে হইলে "চিত্ত"র সম্পাদকের লিখিত সম্মতি প্রয়োজন হইবে।

৬। যে সংখ্যায় যাঁহার লেখা প্রকাশিত হইবে সেই সংখ্যার দুই কপি পত্রিকা লেখককে বিনা মূল্যে দেওয়া হইবে।

৭। "চিত্ত"র বাৎসরিক চাঁদা ৩৲ (তিন টাকা) ; প্রতি সংখ্যার মূল্য ৭৫ নয়া পয়সা মাত্র। পৃথক্ ডাকখরচ দিতে হয় না। বৎসরে যে কোনও সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

সূচীপত্র

একাত্মতা	—জ্ঞানেন্দ্র দাশগুপ্ত ও সুরমা দাশগুপ্ত	১
চিন্তার প্রকৃতি	—প্রভাতকুমার খোপাধ্যায়	৮
মনঃসমীক্ষণের তাৎপর্য	—শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়	১৩
মৃত্যুভয়	—তরুণচন্দ্র সিংহ	১৯
মাথনের কথা	—উদয়চাঁদ পাঠক	২৭
অহম্ এবং অদস্	—সিগমুণ্ড ফ্রয়েড	
	অনুবাদ : সোমনাথ ভট্টাচার্য এবং সন্ধ্যা ভট্টাচার্য	৩৪
ভ্রমবাতুলতা	—কনক মজুমদার	৪২
লুম্বিনি সম্বন্ধে		৪৬
কার্ল গুস্তভ্ ইয়ুং		৫০

চিত্ত

তৃতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা।
বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৬৮ ॥

একাত্মতা

জ্ঞানেন্দ্র দাশগুপ্ত* ও সুরমা দাশগুপ্ত†

অন্যকে বুঝতে হলে, অন্যকে জানতে হলে, অন্যের সুখ-দুঃখ নিজের সুখ-দুঃখ রূপে অনুভব করতে হলে অন্যের সঙ্গে একাত্মীকরণের (identification) প্রয়োজন হয়। একাত্মতায় 'আমি' মনে মনে অন্য হই। নিজের মধ্যে আমরা বড় বেশী আবদ্ধ। আমাদের সুখ-সুবিধা ও প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের দিক্ দিয়ে অন্যকে আমরা বিচার করি, তার স্বরূপ নির্ণয় করি, তার মূল্য নিরূপণ করি। সন্দেশ কী? খাবার জিনিস। চেয়ার কী? বসবার জিনিস। ব্যাবহারিক জীবনে অধিকাংশ মানুষ এইভাবে বস্তুকে দেখে ও বোঝে। স্বার্থ-নিরপেক্ষ, বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টি দিয়ে জ্ঞানের ক্ষেত্রে বস্তুজগতকে বিচার করবার কিছু কিছু চেষ্টা আমরা করি বটে, কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনক্ষেত্রে ঐ দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োগ কদাচিৎই দেখা যায়। বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গীর স্বরূপই বা কী? জীবজগতকে জানবার পন্থা কী? একজন মানুষকে বাইরে থেকে আমরা জানবার চেষ্টা করতে পারি। তার আচার-আচরণ দেখে তার সম্বন্ধে একটা ধারণা আমাদের জন্মায়। কিন্তু যতক্ষণ না আমি মনে মনে, অন্ততঃ ক্ষণেকের জন্যও, 'সে' হতে পারছি ততক্ষণ তাকে জানা আমার অসম্পূর্ণ থেকে যায়। একজন দ্রুত সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে। মুহূর্তের জন্য আমি মনে মনে তার সঙ্গে এক হলাম। মনে হ'ল আমিই যেন সাইকেল চালাচ্ছি। সে যা অনুভব করছে তাও যেন অনুভব করলাম। এই একাত্মীকরণের ক্ষমতা কারও বেশী, কারও কম। এ ক্ষমতা যার বেশী সে সহজে স্বচ্ছন্দে অন্যকে বুঝতে পারে।

---

* অধ্যক্ষ ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ (শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়)
† মনঃসমীক্ষক।

ভালবেসে দুজনে 'এক' হয়, পূর্ণ হয়—এমন কথা অনেক সময় বলা হয়। দুজনের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও বিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব মিলেমিশে একটি বড় 'আমি বা অথও 'আমরা' সৃষ্ট হয়। বলা হয় তারা দুজনে একপ্রাণ বা একাত্মা হ'ল। কিন্তু এই একাত্মতা এবং আমরা যাকে একাত্মতা বা একাত্মীকরণ বলছি এক নয়। ভালবেসে দুজনে 'এক' হওয়া হচ্ছে যুক্ত হওয়া, মিলিত হওয়া—দু'য়ে মিলে একটি 'বড় এক' হওয়া। একাত্মীকরণ হচ্ছে একজন অপরজন হওয়া।

একাত্মীকরণের সঙ্গে দুটো মানসিক প্রক্রিয়ার কিছুটা মিল আছে: প্রক্ষেপ (projection) —আরোপ বললে সঠিক হবে—এবং অন্তঃক্ষেপ (introjection)। নিজের কোনও ইচ্ছা বা আবেগ যখন আমরা অন্যের ঘাড়ে চাপাই, অন্যের উপর আরোপ করি তখন তাকে প্রক্ষেপ বলা হয়। কারও উপর আমার রাগ হ'ল কিন্তু সে-রাগকে স্বীকার করতে আমার বাধছে। এমন অবস্থায় অনেক সময় মনে হয়, আমার তার উপর রাগ নেই কিন্তু সে আমার উপর রাগ ক'রে রয়েছে। মনে মনে যৌন-ইচ্ছা সম্পর্কে বাধা থাকলে সে-ইচ্ছা আমরা অনেক সময় অন্যের উপর আরোপ করি। ভাবটা হ'ল আমার তার প্রতি কোনও যৌন-ইচ্ছা নেই, কিন্তু তার আমার প্রতি আছে। প্রক্ষেপের মধ্যে সাধারণতঃ উদ্বেগ, মানসিক বাধা ও অন্তর্দ্বন্দ্ব থাকে। প্রক্রিয়াটা ব্যক্তির অগোচরেই ঘটে। অর্থাৎ ব্যক্তি জানে না যে তার নিজেরই ক্ষোভ, কামনা বা ইচ্ছা সে অন্যের উপর আরোপ করেছে। বাতুলতায়, বিশেষতঃ ভ্রমবাতুলতা-বা প্যারানোইয়া-নামক মানসিক ব্যাধিতে প্রক্ষেপ বেশী দেখা যায়। নিজের ইচ্ছা অন্যের উপর আরোপ ক'রে রোগী ভাবে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছে, কিংবা তার স্বামী (বা স্ত্রী) অন্যের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। ষড়যন্ত্রের ভ্রান্তি বা অমূলপ্রত্যয়ের মূলে আছে রোগীর নিষ্ক্রিয় সমকামী ইচ্ছা। প্রক্ষেপ ও রূপান্তরণের ফলে রোগীর নিষ্ক্রিয় সমকামী ইচ্ছা আক্রম ও নির্যাতনের ভয় হয়ে দাঁড়ায়। ব্যাপারটা এভাবে দেখানো চলে: 'আমি ভালবাসা চাই' এ কথা স্বীকার করতে মনে বাধে ব'লে, রোগী ভাবে, 'না, আমি চাই না, কিন্তু অমুকে আমাকে ভালবাসতে চায়'। যেহেতু ভালবাসা চাওয়া এবং নেওয়া উভয় ক্ষেত্রেই প্রতিবদ্ধ আছে, অন্যের ভালবাসা-দেওয়ার ইচ্ছাটা তার কাছে উৎপীড়নের ইচ্ছা ব'লে প্রতিভাত হয়। তেমনি কোনও পুরুষের মধ্যে স্ত্রী-ইচ্ছা আছে, আবার তা স্বীকার করতে তার মনে বাধাও আছে। কোনও একজন পুরুষকে দেখে তার নির্জ্ঞাতে যে-ইচ্ছা জাগল সেটা সে আরোপ করল নিজের স্ত্রীর উপর। ভাবটা, আমার কোনও আকর্ষণ পুরুষটির প্রতি নেই কিন্তু আমার স্ত্রীর আছে।

একাত্মতাতে আমি মনে মনে অন্য হই। প্রক্ষেপে আমার কোনও মনোভাব অন্যের উপর আরোপ করি। অন্তঃক্ষেপে অন্যের কোনও মনোভাব নিজের মধ্যে আমি গ্রহণ করি। কিন্তু প্রক্ষেপ বা অন্তঃক্ষেপ কোনও ক্ষেত্রেই 'গোটা আমি'-টা অন্য হয় না। পার্থক্যটা পরিমাণগত না গুণগত এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুব সহজ নয়। 'আমি' আমার মনোভাবের সমষ্টির চেয়ে কিছু বেশী এ কথা যদি মানতে রাজী হই তবে বলা চলে প্রক্ষেপ ও অন্তঃক্ষেপের সঙ্গে একাত্মতার পরিমাণগত ও গুণগত উভয় ধরনের পার্থক্যই আছে। একাত্মীকরণ দুরকমের হতে পারে। সে আমি হলাম; আমি সে হলাম। প্রথমটাতে জোরটা হচ্ছে 'আমি'-র উপর; দ্বিতীয়টাতে, 'সে'-র উপর। আরও একভাবে বলা যেতে পারে যে একটাতে আমার জায়গাতেই ব'সে 'আমি' 'সে' হলাম। অপরটাতে তার জায়গায় গিয়ে 'আমি' 'সে' হলাম। দু'একটা দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টা আরও একটু পরিষ্কার হবে। ট্রামে চড়বার পর, শিশু বাড়িতে এসে নিজে ড্রাইভার হ'ল। ড্রাইভারের ব্যক্তিত্ব ও আচরণ নিজের উপর সে আরোপ করবার চেষ্টা

করল। শিশুর ভাবটা আমি ড্রাইভার হয়েছি। আমরা যখন নিবিষ্ট চিত্তে নভেল পড়ি, নভেলের নায়ক বা নায়িকার মধ্যে নিজেদের হারিয়ে ফেলি, তারা যা করছে ভাবছে আমরাও যেন তাদের সঙ্গে, সঠিকভাবে বলতে গেলে, একাত্মা হয়ে তেমন করছি। সংক্ষেপে, আমরা নায়ক-নায়িকা হই।

ছোটরা বড়দের অনুকরণ করে। সে বাবা হয়ে অফিস যায়, কানাই মাষ্টার হয়ে বিড়ালকে প'ড়ো ক'রে শাসন করে, মা হয়ে রান্না-বান্না ক'রে ছোটদের দেখাশুনা করে। ছোটরা বড় হতে চায়, সেজন্যই তারা বড় হয়। বড়দের সঙ্গে ছোটদের এ একাত্মীকরণ যে বহুলাংশে অসম্পূর্ণ এখানে এ কথা শুধু ব'লে রাখি। পরে এ বিষয়ে আলোচনা করা যাবে।

কারও কান্না দেখলে ছোটদের কান্না পায়, কাউকে হাসতে দেখলে ছোটরা হাসে। এর মধ্যে অনুকরণ আছে, সহানুভূতিও আছে। অনুকরণ ও সহানুভূতির মধ্যে একাত্মীকরণের চেষ্টাটা স্পষ্ট।

অন্যের দুঃখ-কষ্টকে কিছুটা নিজের দুঃখ-কষ্ট ব'লে অনুভব করা মানুষের ধর্ম। কোনও কোনও ব্যক্তির এ অনুভূতি প্রবল। অন্যের দুঃখ দেখলে এঁরা অভিভূত হন। তবে অন্যের দুঃখ দূর করবার জন্য যে এঁরা সর্বদা সচেষ্ট হন এ কথা সত্য নয়। হিস্টেরিক্যাল মনোভাব যাদের তাদের মধ্যে এ জাতীয় সহানুভূতি বেশী দেখা যায়। একটা ঘটনা বলি। ছেলের হাত পুড়ে গেছে—তাই দেখে (ভাল ক'রে দেখতেও পাচ্ছেন না) 'আমার হাত জ্বলে গেল' 'আমার হাত জ্বলে গেল' ব'লে ব্যাকুল হয়ে মা কাঁদছেন। তিনি এতটা অভিভূত হয়েছেন যে ছেলেকে কোনও রকম সাহায্য করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। এ সব ক্ষেত্রে সে আমি হই। তাকে আমি নিজের মধ্যে নিজের মতন ক'রে দেখতে পাই। অনুকরণ ও সহানুভূতির মধ্যে, হিস্টেরিক্যাল-মনোভাবাপন্ন লোকদের মধ্যে, এ জাতীয় একাত্মীকরণ বেশী দেখা যায়। এর খানিকটা যে শিশুজনোচিত তাতে সন্দেহ নেই।

অন্যকে দেখে মনে মনে তার জায়গাতে গিয়ে আমি সে হলাম; একাত্মীকরণের এই ধরনটাকে আমরা সমানুভূতি বা অনুবেদনা (empathy) বলব। রিক্‌শাওয়ালা রিক্‌শা চালাচ্ছে—তাকে দেখে মনে মনে মুহূর্তের জন্য রিক্‌শাওয়ালা হয়ে গিয়ে তার দেহ-মনের অবস্থাটি আমি উপলব্ধি করলাম। ফুটবল খেলা দেখতে গিয়ে খেলোয়াড়ের সঙ্গে আমরা একাত্মা হই। রূপালি-পর্দায় ঘনগাঢ় মুহূর্তে নায়ক-নায়িকার সঙ্গে আমাদের একাত্মতা ঘটে—মনে মনে তাদের সঙ্গে আমরা বিচরণ করি, তাদের কাজ, আবেগ ও অনুভূতির সঙ্গে সম্পূর্ণ অন্তরঙ্গ হই।

আমি 'সে' হয়েছি এ কথার অর্থ আরও স্পষ্ট ক'রে বোঝবার চেষ্টা করা দরকার। বস্তুগত ভাবে একজন মানুষ অন্য এক মানুষ হতে পারে না। নিজের দেহ-মনের বাইরে আমরা যাব কেমন ক'রে? আমি 'সে' হয়েছি এ উক্তির সঠিক উত্তর হ'ল আমি 'সে' হয়েছি এমন একটা বোধ, এমন একটা অনুভূতি। আমি যখন 'সে' হই তখন আমার মনে হয় তার জায়গা আমার জায়গা, তার আচরণ আমার আচরণ। কিন্তু এটুকু হলেই একাত্মীকরণ হয়েছে ব'লে কি মনে করা যায়? না। যতক্ষণ না তার অনুভূতি আমার অনুভূতি হয়, সঠিকভাবে বলতে গেলে, যতক্ষণ না তার মতন আমার অনুভূতি হচ্ছে ততক্ষণ একাত্মীকরণ বাহ্যিক এবং আংশিক।

রিক্‌শাওয়ালাকে রিক্‌শা টানতে দেখে আমি ভাবলাম রিক্‌শাওয়ালার নিশ্চয় খুবই কষ্ট হচ্ছে। আমাকে রিক্‌শা টানতে হলে যে-কষ্ট ও মনোভাব হয়তো আমার হ'ত সেটা আমি রিক্‌শাওয়ালার উপর আরোপ করলাম। তার অনুভূতিটা ঠিক ধরতে পারলাম না। বছরের পর বছর যে রিক্‌শা চালায়,

রিক্‌শা চালিয়ে সে শুধু কষ্টই পায় এমন নয়। ভালমন্দ অনেক রকম অনুভূতিই তার হয়। আসলে কিন্তু তার মনোভাব আমার মনোভাব হয় নি। এ জাতীয় একাত্মতা আংশিক এবং কিছুটা ভ্রান্তও বটে।

আংশিক ও সময় সময় ভ্রান্ত একাত্মতাই আমাদের অধিকাংশের জীবনে ঘটে। তাই মানুষে মানুষে ভুল বোঝার আর অন্ত নেই। সম্পূর্ণ ও সঠিক একাত্মতা তাদের পক্ষেই সম্ভব যাদের প্রক্ষোভজ জীবনস্রোত সহজ এবং স্বচ্ছন্দ। একটি ছেলে কাদার মধ্যে গড়াগড়ি যাচ্ছে; তাতেই তার আনন্দ। কাদায় যার বিশেষ ঘেন্না, ছেলেটির আনন্দ সে বুঝবে কেমন ক'রে? এক মুহূর্তকাল ছেলেটির জায়গায় নিজেকে মনে মনে কল্পনা ক'রে সে শিউরে উঠল—কাদার মধ্যে গড়াগড়ি খাওয়া, এর চেয়ে খারাপ আর কী হতে পারে। একটি নির্ভীক-দক্ষ শিকারী তার বাঘ-শিকারের গল্প বলছে—বাঘের সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে বাঘকে সে গুলি ক'রে মারল। ছেলেটি শুনছে আর ভয়ে জড়সড় হচ্ছে। বাঘ যদি শিকারীর গায়ে লাফিয়ে পড়ত! তার নিজের ভয় ও দুর্বলতার (যার মূলে রয়েছে তার অবদমিত আত্মনতির প্রেষণা) দরুন শিকারীর সঙ্গে একাত্মা হতেই পারল না, শিকারীর মনোভাবও সে বুঝতে পারল না।

যে-সব ক্ষেত্রে আমরা 'ভুল বুঝি' সেখানে সাধারণতঃ আমরা আমাদের নিজের কোনও মনোভাব অন্য কোনও ব্যক্তির উপর প্রক্ষেপ বা আরোপ করি। সূক্ষ্ম বিচারে সমানুভূতির মধ্যেও প্রক্ষেপের স্থান রয়েছে। সত্যি সত্যি 'আমি' তো আর 'সে' হতে পারছি না। তাকে বুঝতে আমার অনুভূতিরই সাহায্য নিতে হচ্ছে। সে কোনখানে কী অনুভব করছে বুঝতে গেলে তার উপর আমার অনুভূতিই প্রক্ষেপ করতে হবে। প্রক্ষেপ ও একাত্মতা এক নয়, এ কথা পূর্বেই বলেছি। এখানে শুধু যোগ করব যে, একাত্মতায় প্রক্ষেপেরও কিছু স্থান রয়েছে। প্রকৃত এবং ভ্রান্ত উভয় প্রকারের একাত্মতাতেই 'আমি' মনে মনে 'সে' হই; নিজের অনুভূতি অন্যের উপর প্রক্ষেপ করি এবং সেটা তার অনুভূতি ব'লে মনে করি। সম্পূর্ণ ও প্রকৃত একাত্মতাতে অপরের সদৃশ অনুভূতিই আমি অপরের উপর প্রক্ষেপ করি। আংশিক ও ভ্রমাত্মক একাত্মতাতে সে যা অনুভব করছে তেমন অনুভূতি তার উপর প্রক্ষেপ না ক'রে আমার অন্য একটা অনুভূতি তার উপরে প্রক্ষেপ বা আরোপ করি।

যা একজনের নয় তেমন কোনও অনুভূতি তার উপর আরোপ করাকে সাধারণতঃ মনোবিদ্যায় প্রক্ষেপ বলা হয়। এই অর্থে ভ্রমাত্মক একাত্মতায় প্রক্ষেপ রয়েছে, কিন্তু প্রকৃত একাত্মতায় প্রক্ষেপ নেই। কিন্তু প্রক্ষেপ কথাটা যদি শব্দগত অর্থে ব্যবহার করা যায় তবে বলব উভয় ধরনের একাত্মতাতেই প্রক্ষেপ রয়েছে। ভ্রমাত্মক একাত্মতায় প্রক্ষেপ আরোপের রূপ গ্রহণ করে। তাই ভ্রমাত্মক প্রক্ষেপকে প্রক্ষেপ না ব'লে আরোপ ব'লে অভিহিত করলেই বোঝাটা আরও সহজ ও সঠিক হয়।

রোগীর মানসিক প্রতিবন্ধ দূর ক'রে তার প্রক্ষোভজ গতিকে সহজ ও স্বচ্ছন্দ করা মনঃসমীক্ষণের প্রধানতম লক্ষ্য। অতএব এ কথাও বলা যেতে পারে সফল মনঃসমীক্ষণের দ্বারা রোগীর অন্যের সঙ্গে ঐকাত্ম লাভের-পথে যে-সব বাধা থাকে তা দূর হয়; একাত্মীকরণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

একাত্মীকরণের ক্ষমতা মানসিক স্বাস্থ্যের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। নিজে সুখী হতে হলে, অপরকে সুখী করতে হলে এ ক্ষমতার খুবই প্রয়োজন। পরস্পরকে না-বোঝা, পারিবারিক জীবনে অশান্তির একটা বড় কারণ। স্বামী স্ত্রীকে বোঝে না, মা বাবা তাদের ছেলেমেয়েদের বোঝে না।

ছেলেমেয়েরা মা বাবাকে বোঝে না। শুধু বোঝে না বললেও ভুল বলা হবে। আমরা পরস্পরকে ভুল বুঝি। অপরের সঙ্গে আমাদের প্রকৃত একাত্মতা ঘটে না।

একাত্মীকরণের প্রতিবন্ধ কোথায়? একাত্মীকরণ কখন সম্ভব? এ সকল প্রশ্নের উত্তর যে স্পষ্ট ক'রে আমাদের জানা আছে তা বলা চলে না। তবে যতটা এখনও পর্যন্ত বোঝা গেছে ততটা এখানে বলবার চেষ্টা করা যাক।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে প্রকৃত একাত্মীকরণ যেখানে ঘটে না, সেখানে পরস্পর পরস্পরকে ভুল বোঝে। অন্যকে বুঝি না, কারণ নিজেকে আমরা বুঝি না। নিজেকে জানতে আমাদের বাধা তাই নিজের কাছ থেকে নিজেকে আমরা গোপন ক'রে রাখি। আমরা প্রত্যেকে এক একটি বিশ্বভূমণ্ডল, আমাদের ব্যক্তিত্বের মধ্যে সাধু, অসাধু, শিশু, পুরুষ, স্ত্রী সব কিছুই সমাবিষ্ট রয়েছে। পুরুষ-কাম, স্ত্রী-কাম, সমকাম, নিষ্ক্রীয় সমকাম, ধ্বংসাত্মক-ইচ্ছা, মরণেচ্ছা, মাতৃগর্ভ-যাবার ইচ্ছা প্রভৃতি নানারকম ইচ্ছা কমবেশী পরিমাণে রয়েছে। ব্যক্তিত্বের কোনও কোনও দিক, কোনও কোনও ইচ্ছাকে স্বীকার করতে আমাদের মনে আপত্তি থাকে। ব্যক্তিত্বের সেই সমস্ত রূপ পরিগ্রহ করা আমাদের পক্ষে কঠিন; সেই সব ইচ্ছাকে স্বীকার করতে, মনে মনে ভোগ করতে আমরা বাধা পাই। অন্যের মধ্যে যখন ঐ জাতীয় ইচ্ছা বা ব্যক্তিত্বের অস্পষ্ট পরিচয় পাই, প্রায় দেখবার আগেই তখন আমরা চোখ ফিরিয়ে নি; সেজন্য তাদের আমরা বুঝতে পারি না। খুশি মতন (যেটা অনেকাংশে নির্জ্ঞাত) অন্য কোনও ইচ্ছা বা ব্যক্তিত্ব তাদের উপর আরোপ করি। ফলে ভুল বোঝা আরম্ভ হয়। এজন্যই বলা যেতে পারে, নিজের কাছে নিজে যে স্বচ্ছ নয় অন্যকে বোঝা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

তারপর বলতে হয় অন্যকে বুঝতে মনে মনে অন্য হতে-চাওয়া দরকার। চাই বলেই আমরা অন্যের সঙ্গে একাত্মা হই। একাত্মীকরণের ক্ষমতা ঐকাত্ম-লাভের জন্য পর্যাপ্ত নয়। শিশু মা হতে চায়, বাবা হতে চায়, তাই সে, মা বাবা হয়। মা হতে চাওয়া, বাবা হতে চাওয়ার মূলে কী আছে? বড়দের সুখ-সুবিধা শিশু পেতে চায়, বড়দের ক্ষমতাও। বাবা হয়ে সে মাকে পাবে, মা হয়ে সে বাবাকে পাবে—এটা বড় হতে চাওয়ার একটা বড় কারণ। কিন্তু শিশু মনে মনে সম্পূর্ণ মা কি বাবা হতে পারে না। কারণ শিশু অপরিণত, তার মধ্যে বয়স্কদের ব্যক্তিত্ব তখনও পরিস্ফুট হয় নি। তবে এ কথাও ঠিক যে শিশুকে আমরা যতটা শিশু মনে করি সে প্রকৃত পক্ষে ততটা শিশু নয়। অনেক বয়স্ক-ইচ্ছাই দুর্বল ও ছাড়া-ছাড়া ভাবে শিশুর মধ্যে আছে। সেই কারণেই সবটা না পারলেও, বড়দের মনকে তারা কিছুটা ধরতে পারে। কোনও কোনও বয়স্ক ব্যক্তির শিশু-মনের সঙ্গে সহজ পরিচয় রয়েছে দেখা যায়; আবার কেউ কেউ শিশু-মনকে অবদমিত করেছে, নিজের শৈশবকে ভুলে গেছে। আমি এক কালে ছোট ছিলাম, কি করেছি আর কিনা করেছি ভাবতেও কেউ কেউ লজ্জা বোধ করে। এরা নিজেদের বহু শৈশব-ইচ্ছাকে, নিজেদের শিশু-মনকে অনেকাংশে মনের অতলে নির্বাসিত করেছে। নিজের শিশু-মন যাদের কাছে মুক্ত অবারিত, তারা সহজেই শিশুদের বুঝতে পারে। সাধারণতঃ যাদের আমরা ভালবাসি, তাদেরই আমরা বুঝতে চাই, আমরা বুঝতে পারি।

পুনরালোচনা করতে গেলে বলতে হয় একাত্মীকরণের দুটো দিক আছে তা আমরা দেখলাম। প্রথমতঃ, 'সে' **আমি** হলাম; দ্বিতীয়তঃ 'আমি' **সে** হলাম। 'সে' **আমি** হওয়াটা শিশু ও অপরিণত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রধানতঃ দেখা যায়। এ জাতীয় একাত্মীকরণে ব্যক্তির মানসিক অপরিণতির

দরুন পুরাপুরি অন্যের মনোভাব গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। এ কারণে বলা যেতে পারে এ জাতীয় একাত্মীকরণ আংশিক এবং কিছুটা ভ্রমাত্মকও।

এ জাতীয় একাত্মীকরণের মূল্য কী? এ প্রশ্ন আমাদের মনে আসতে পারে। শিশু বড় হতে চায়। বড়র মতন ব্যবহার করতে চায়, অনুভব করতে চায়। কিন্তু সে-সব করার মতো শক্তি তখনও পুরাপুরি তার মধ্যে হয় নি। তাই কল্পনা করে সে বড় হয়েছে, বাবা হয়েছে, মা হয়েছে ইত্যাদি। এই বড় হওয়ার অভিনয়, বড়-হওয়ার কল্পনা তাকে কিছুটা তৃপ্ত করে। বিষয়টা আরও এক ভাবে দেখা যায়। শিশু প্রধানতঃ অন্যের ইচ্ছা মতো চলে। এই যে শিশুজনোচিত নিষ্ক্রীয়তা বা আত্মনতি এটাতেও একটা তৃপ্তি আছে। কিন্তু জীবনের ছন্দে আত্মনতি ও আত্মপ্রতিষ্ঠা দুটোরই প্রয়োজন আছে। এ দুটো প্রেরণার ছন্দময় পরিতৃপ্তি না ঘটলে মনের ভারসাম্য ক্ষুণ্ণ হয়। শক্তি অর্জন ক'রে বড়রা বাস্তবজীবনে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে, নিজেদের সক্রিয়-ইচ্ছার পরিতৃপ্তি ঘটায়। শক্তির অভাব হেতু শিশুকে কল্পনায় নিজের সক্রিয় এবং প্রতিষ্ঠার বাসনাকে চরিতার্থ করতে হয়। শিশু হয়ে সে নিজে পড়ে, আবার কানাই মাষ্টার হয়ে সে পড়ায়। শিশু হয়ে মা-বাবার আদর সে ভোগ করে, মা-বাবার কথা সে শোনে। আবার মনে মনে মা বাবা হয়ে সে পুতুলকে আদর করে, পুতুলকে হুকুম করে, শাসন করে।

'আমি' সে হলাম। এই জাতীয় একাত্মতা পরিণত বয়সেই সাধারণতঃ দেখা যায়। মানসিক স্বাস্থ্য যে-সব ক্ষেত্রে ভাল সে-সব ক্ষেত্রে এ জাতীয় একাত্মীকরণ অপেক্ষাকৃত সঠিক ও সম্পূর্ণ হয়। তবে এ কথা বলা চলে যে অধিকাংশ লোকেরই মনের সহজ গতি বহুলাংশে বাধাপ্রাপ্ত ও আবদ্ধ। সেজন্যই তাদের একাত্মতা এবং অনুবেদনা হয় আংশিক এবং অনেকাংশে ভ্রান্ত।

সঠিক একাত্মীকরণের দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে বুঝতে পারে। একজন অপরের সুখ-দুঃখের অংশ গ্রহণ করতে পারে। অন্যের সুখ-দুঃখ নিজের ব'লে বোধ হয়—নিজের কথার সঙ্গে সেজন্যেই অন্যের কথা আমরা ভাবি। ভালবাসা এবং একাত্মীকরণের ক্ষমতা এবং ইচ্ছার উপরই গ'ড়ে ওঠে সুন্দর ও সুসমঞ্জস পারিবারিক ও সামাজিক জীবন।

একাত্মতার সঙ্গে দ্বিমুখী মনোভাবের সম্বন্ধ আছে, ফ্রয়েড এ কথা বলেছেন। তাঁর উক্তির অর্থ আমরা এভাবে বুঝেছি। ইডিপস অবস্থায় ছেলে মাকে চায়; বাবা তার প্রতিদ্বন্দ্বী। সেজন্য বাবাকে সরিয়ে বাবার স্থান সে অধিকার করতে চায়। বাবার স্থান গ্রহণ, বাবার মতো ব্যবহার (behaviour) করাকে আংশিক একাত্মীকরণ বলা যেতে পারে। যাকে ভালবাসা যায় তার অবর্তমানে অন্তঃক্ষেপের দ্বারা তার মতো হওয়া, স্বাভাবী এবং অস্বাভাবী উভয়ক্ষেত্রেই দেখা যায়। একটি ছেলের পোষা বিড়ালটি হারিয়ে গিয়েছিল। বিড়াল খুঁজে না পেয়ে, শেষে নিজেই সে বিড়াল হয়ে ব'সে রইল। সমীক্ষণের দ্বারা এর মধ্যে ভালবাসা ও রোষ দুই জাতীয় মানসিক উপাদানই হয়তো পাওয়া যাবে।

রোষ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা যে-একাত্মতা ঘটায় তার মধ্যে ব্যবহারের সমতা ও সাদৃশ্য থাকলেও মনোভাব দুটোক্ষেত্রে কদাচিৎই এক হয়। ভালবেসে যখন দুজনে একাত্মা হয়, তখনই একজন অন্যের মনোভাব ধরতে পারে।

বয়স্কদের অনুবেদনা বা সমানুভূতি সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলা চলে। যাদের আমরা অবজ্ঞা করি তাদের সঙ্গে আমাদের একাত্মতা ঘটে না, তাদের আমরা ভুল বুঝি। প্রথম মহাযুদ্ধে ফরাসী

সৈন্যদের কেউ কেউ ভাবত জার্মানরা মানুষের মাংস খায়। সমাজে যারা অবহেলিত নির্যাতিত তারাও যে মানুষ, সুখ-দুঃখ মান-অপমান তাদেরও যে আছে, এ কথা অনেক সময় আমরা বুঝতে পারি না। নিজেদের মনের, নিজেদের অহঙ্কারের বেড়াজালে আমরা এমনই আবদ্ধ। নিজেদের মন বাধামুক্ত থাকলে যাদের আমরা ভালবাসি, যাদের আমরা আপন মনে করি, আমাদের মতন মনে করি, তাদের সঙ্গে আমাদের একাত্মতা ঘটে। অতিশয় ভক্তি একাত্মতার পথে বাধা হয়। ভক্তির দ্বারা মানুষকে আমরা অতিমানুষ বানাই, ভগবান বানিয়ে তুলি। তাদের সঙ্গে একাত্মা হয়ে তাদের সত্যি সত্যি বোঝা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। ভালবাসা কোনও কোনও ক্ষেত্রে অন্ধ হয়। এ জাতীয় ভালবাসা বহুলাংশে অপরিণত; এটা আত্মপ্রেমেরই একটা রূপ। ভালবাসায় মা-বাবা অনেক সময় নিজেদের ইচ্ছা শিশুদের উপর আরোপ করে; ফলে শিশুদের সঙ্গে একাত্মা হয়ে তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা বুঝতে পারে না।

চিন্তার প্রকৃতি

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, এম. এস্‌সি *

মানুষ মাত্রই চিন্তা করে। কোনও সময়েই তার মন ফাঁকা থাকে না। কোনও না কোনও বিষয়ের ভাবনা, চিন্তা, দিবাস্বপ্ন তার মানসিক গতিকে ভরিয়ে রাখে। কার্য্যকারণভেদে চিন্তার প্রকৃতি কী তা জানা পণ্ডিতসমাজের বহু পুরানো এক সমস্যা। বহু দার্শনিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বহু কূটতর্ক হয়ে গেছে, এখনও হচ্ছে; কিন্তু কোথায় যেন একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে যা আজও পূরণ করা সম্ভব হয় নি। দর্শনের পরিধিতে এই বিষয়ে বোধহয় নতুন কিছুর আশা করার সময় শেষ হয়ে গেছে, কারণ ব্যাপকতার বিচারে দর্শন এমন এক চরম পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যে তাকে আবার নতুন ক'রে বস্তুমনের সীমিত পরিধিতে কল্পনা করা এক রকম অসম্ভব। উনবিংশ শতকের কয়েকজন পণ্ডিতের কাছে বোধহয় এই ধরনের পরিচয় প্রতিভাত হয়েছিল যার প্রভাবে প্রায়োগিক মনোবিদ্যা বা মনোবিজ্ঞানের জন্মলাভ হয়। এরই সঙ্গে সঙ্গে আবার শুরু হয়েছে মানুষের ভাবনা-চিন্তার প্রকৃতি নির্ণয়ের গবেষণা।

মানুষ কাজ করে, হাসে, কাঁদে, খেলা করে—কত কি তার ব্যবহারের পরিচয়! এই পরিচয়ের শারীরিক পরিক্রমার কথা বাদ দিলে দেখতে পাওয়া যায় এর সবটুকু অনুস্যূত হয়ে আছে তার চিন্তার, তার ভাবনার কেন্দ্রে। তার উন্নতি, তার পতন, তার ভাল, তার মন্দ—এক কথায় মানুষ তার জীবন থেকে যতটুকু আশা করতে পারে সবটুকুই তার সেই চিন্তাশক্তির আশ্রয়লব্ধ ফল। এই যে এত জানা সার্ব্বজনীন পরিচয়ে সমৃদ্ধ এই চিন্তার রূপ কী? এর সংজ্ঞা কী? এ সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথাই বলেছেন; কোনওটা গ্রাহ্য হয়েছে, কোনওটা হয় নি। হয়তো কোনও দিনই মতের মিল হবে না, এর কারণ মানুষের প্রাতিস্বিকতা। ব্যবহারিক বিশ্লেষণে মনোবিদ্যার মতে চিন্তার সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে কোনও সমস্যা-সমাধানের মানসিক প্রক্রিয়া হিসাবে। খুব সাধারণভাবে দেখতে গেলে বোঝা যায় মানুষের জীবন-মন সব সময়েই কোনও না কোনও সমস্যা-সমাধানে ব্যস্ত, তার মানসিক-প্রতিফলিত-রূপ হ'ল চিন্তা, ভাবনা। অবশ্য এই সংজ্ঞার পরিচয় বহু দশকের গবেষণার মধ্য থেকে পাওয়া গেছে। পুরানো যুগের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায়, বিভিন্ন যুক্তির মাধ্যমে দেখবার চেষ্টা হয়েছিল চিন্তার সঙ্গে সংজ্ঞান অনুভূতির ক্ষেত্রকে। তাঁরা ভাবতেন, মানুষ যখন কোনও বর্তমান বিষয়ের বিচার করতে বসে, তুলনা করে, তখন ঐ ধরনের কিছু অতীত প্রতিরূপের উপর নির্ভর করেই তা করা হয়। কিন্তু ১৯০১ সালে অধ্যাপক মারবে (K. Marbe) দেখালেন চিন্তার সঙ্গে প্রতিরূপের কোনও সম্পর্ক নেই—একটা কিছু অতীত সম্পর্কবোধ সব চিন্তার মধ্যেই থাকতে পারে, তবে তার রূপ আলাদা। কী সেই রূপ? ১৯০৫ সালে আর একজন মনোবিৎ য়্যাক (N. Ach) শুরু করলেন আর একটা ছোট পরীক্ষা। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল পাটিগণিতের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের সঙ্গে সঙ্গে পরিক্ষার্থীরা তাদের মনের গতিকে অনুধাবন করুক। প্রথম প্রথম তিনি তাদের কাছ থেকে

* মনোবিদ্যা-বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

শুনলেন কাজটা সম্পর্কে "একটা কিছুর" সংজ্ঞাত অনুভূতির বিবরণ। পরে তিনি দেখলেন এই ধরনের সমস্যা সমাধানে কাজটাই মুখ্য হয়ে গেছে—এমন কি কী ক'রে করতে হবে তাও কাজটার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভূত হয়ে গেছে। চিন্তার অস্তিত্ব তখন অন্তর্নিহিত ফল্গুর মতো বইতে আরম্ভ করেছে। তিনি এই রূপের পরিচয়ে বললেন চিন্তা সংজ্ঞাত অনুভূতির কোনও মৌল-প্রকৃতি নয়। মনের পরিচয়ে এইভাবে চিন্তা আর চিন্তার আধারকে একত্রীভূত করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি মারবের প্রশ্নের অনেকখানি জবাব পেলেন।

একই বছরে ওয়াট (H. J. Watt) আরও কতকগুলি পরীক্ষা আরম্ভ করলেন। তিনি শুরু করলেন কতকগুলি অসমাপ্ত বাক্য ও শব্দের বিপরীতার্থক, ক্ষুদ্রতর, বৃহত্তর ইত্যাদি পাদপূরণের মানসিক প্রক্রিয়ার রূপসন্ধান। এর ভিতরে তিনি য়্যাকেরই মতো ফল পেলেন, তবে তিনি পেলেন আরও একটি মানসিক প্রক্রিয়ার সন্ধান—কাজ সমাধার "প্রচেষ্টা" বা "ইচ্ছার"। য়্যাকের বিশ্লেষণে যে রূপ পাওয়া গেছে ওয়াট তার যুক্তি খুঁজে পেলেন। চিন্তা-করার সময়ে মন থেকে সেই চিন্তার পরিচয়ে কর্মবিষয়ের যথাযথ সংজ্ঞাত অনুভূতি থাকে না, থাকে কেবল একটা ইচ্ছা। এই ইচ্ছা যুক্ত ক'রে দেয় সমস্যা-সমাধানের বিভিন্ন প্রক্রিয়াকে একে অপরের সঙ্গে। যে ইচ্ছা করে তার কাছে এই ইচ্ছার রূপ নেই; কাজটিই এই ইচ্ছার মানসিক প্রতিফলন। এই বৈশ্লেষণিক রূপের খতিয়ান করার ইচ্ছার উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সমস্যার সঙ্গে চিন্তার একটা বিচ্ছেদ হয়। যেমন ধরা যাক্, কেউ অঙ্ক কষছেন; যতক্ষণ একের পর এক অঙ্কটির পর্যায়ক্রম হচ্ছে, তিনি বুঝতেই পারবেন না তাঁর মন কী ভীষণভাবে চিন্তা করছে। অঙ্কটি কষতে কষতে তিনি চিন্তা করুন, তিনি কি ভাবছেন—সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যাবে তাঁর মনের গতি। অঙ্কটি শেষ হয়ে যাক, এইবার তিনি চিন্তা করুন, তাঁর মনে তখন অঙ্কটির স্মৃতিই আসবে; তার অংশবিশেষের বিভিন্ন অনুধাবনের প্রক্রিয়াগুলি একের পর এক মনে ভেসে উঠবে; হয়তো বা শারীরিক কিছু কিছু বিষয়ের কথাও মনে হতে পারে—তা ছাড়া চিন্তা সম্বন্ধে আর কিছু জানা তার পক্ষে সম্ভব হবে না। এই প্রসঙ্গে বলা যায় কোনও কিছুই কার্যকারণ-সম্বন্ধ ব্যতিরেকে সংঘটিত হতে পারে না। উদ্দীপক, প্রত্যক্ষ এবং ইচ্ছাশক্তির সংজ্ঞান পরিচয়টা খুবই নগণ্য। কারণ ইচ্ছার অধিকাংশ প্রক্রিয়াই নির্জ্ঞাতভাবে সক্রিয়। আর চিন্তা যখন ইচ্ছাশক্তির উপর নির্ভরশীল তখন তার মূল অংশ নির্জ্ঞানস্তরের অভিক্ষেপণের দ্বারা সংবেদিত। অপরক্ষেত্রে চিন্তা-উদ্দীপক যে কর্মটি বর্তমান, সংজ্ঞান পরিচয়ে তাই একমাত্র বাস্তব-প্রত্যয়। সেই জন্যেই মনে হয়, গবেষণাগারের সেই নির্ণীত তথ্য চিন্তা পরিচয়ের মধ্যে বাস্তব প্রত্যয়েরই রূপ।

মানুষের সাধারণ চিন্তাও সংজ্ঞান মনের পরিধিতে সীমায়িত নয়। মানুষের চিন্তা হয়তো শুরু হয় কোনও সংজ্ঞাত মননের মাধ্যমে, কিন্তু তার ব্যক্তিগত মানসিক পরিক্রমায় সংজ্ঞান মনের কোনও সম্পর্ক থাকে না। পরে সমস্যা সমাধানের সফলতা ও বিফলতার প্রশ্ন যখন আসে, তখন আবার নির্জ্ঞান মনের পরিচয় আমরা পাই। সমাধানের সফলতা তখনই সম্ভব যখন সেটা বর্তমানের কোনও বাস্তব ভাব বা প্রত্যক্ষের প্রতিরূপায়িত হয়। যদি না হয়, তবে সাধারণের চোখে তা অসফল; কিন্তু অন্য দিকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে সেটা নতুনত্ব। অবশ্য বিজ্ঞানের আবিষ্কারের পিছনে আরও অনেক কিছু থাকে যার কথা বর্তমান প্রবন্ধে বলা প্রাসঙ্গিক হলেও, অন্য সময়ের জন্য নির্দিষ্ট রাখাই উচিত বিবেচনা করলাম।

মূল প্রসঙ্গে আসা যাক। চিন্তা গবেষণার আর একটি ব্যবহারিক রূপ দেখালেন বুলার। তিনি চিন্তা কী এ-সম্পর্কে আলোচনা না ক'রে, প্রশ্ন করলেন চিন্তা করলে মনের অবস্থা কী হয়। তাঁর যুক্তি হ'ল, চিন্তার ধরনটা নির্ণয় করতে পারলে সত্যিকারের চিন্তার অনুধাবন করা যাবে। কেবল গুণভাগ বা যোগ-বিয়োগ কিংবা অর্থ করা বা বিপরীতার্থক শব্দ নির্ণয় এগুলির মধ্যে চিন্তার রূপ খুঁজে পাওয়া যাবে না, কারণ এই সমস্যাগুলির প্রত্যক্ষ যান্ত্রিকতা। চিন্তার অন্তর্দর্শনের জন্য চাই এমন সমস্যা যা মানুষের চিন্তার উপযুক্ত। অনুধাবন সমস্ত প্রক্রিয়ার মধ্যেই একটা স্বতঃক্রিয় ভাবের সৃষ্টি হয় যা আসল উদ্দেশ্যকেই নষ্ট ক'রে দেয়। এই জন্যে তিনি এমন কতকগুলি সমস্যা দিলেন যেগুলিকে সত্যই গভীর অনুধাবন করলে তবে সমাধান করা সম্ভব। এই সমস্যা-সমাধানের রূপ বিচারে তিনি পেলেন: (১) প্রত্যেক চিন্তাই কোনও সংবেদন-প্রকারতার মাধ্যমে চিহ্নিত হয়, (২) তারপর আসে কোনও অনুভূতি, (৩) তারপরে সমস্ত মানসিক স্তরের উপরে যেন সন্দেহ, বিস্ময়, পীড়ন ইত্যাদি ভাবে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। বুলার বললেন চিন্তিত প্রক্রিয়ার সংজ্ঞাত ভাবই এই মানসিক রূপ। এটাকে মানুষের মানসিক জীবনে জ্ঞান ও অভিজ্ঞানের মধ্যে একটা ভাব হিসাবে কল্পনা করা হয়েছে। কিন্তু এই ভাবের মধ্যে আরও একটা কিছু আছে যাকে কোনও সংবেদন-প্রকারতায় বা কোনও অনুভূতির মাধ্যমে সঞ্জায়িত করা যায় না—"একটা যেন আছে চিন্তা—একটা বোধ।" বুলার এই বোধকে সঞ্জায়িত করলেন, "চিন্তা মৌল" রূপে। সংবেদন, অনুভূতি বা প্রতিরূপ, তখনকার দিনের মনো-মৌলিক মানসিক প্রক্রিয়াগুলির সঙ্গে বুলার এর কোনও সম্পর্ক খুঁজে পেলেন না। তিনি তাই চিন্তাকে নতুন আর এক মৌলিক মানসিক ভাবরূপে কল্পনা করলেন।

চিন্তা সম্পর্কে উপরোক্ত পরীক্ষাগুলি এবং আরও বহু ছোট ছোট পরীক্ষা ঐ সময়ে শুরু হয়েছিল জার্মানীর উর্জবার্গ (Wurzberg) বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক অসওয়াল্ড কুল্পে (Oswald Kulpe)-এর পৃষ্ঠপোষকতায়। বিখ্যাত ভ্যাণ্ড (Wundt) এবং তার সুযোগ্য ছাত্র এডওয়ার্ড টিচেনার (Edward Titchener) তখন মানসিক প্রক্রিয়ার মৌলিকতা প্রমাণে এক রকম নিঃসন্দেহ হয়েই এগিয়ে চলেছেন মনোবিদ্যাকে পদার্থবিদ্যা এবং শারীরবৃত্তের মতো বস্তুতান্ত্রিক রূপ দেবার আশা নিয়ে। এঁদের মতে মননের বিশ্লেষণে মাত্র তিনটি মৌলিক রূপ দেখা যায়—সংবেদন, প্রতিরূপ, ও অনুভূতি। এই গুলিরই বিভিন্ন গুণের বিভিন্ন প্রকারের সংমিশ্রণে মানুষের বিভিন্ন মনোভাবের উদয় হয়। উর্জবার্গ সমষ্টির চিন্তা-সম্বন্ধীয় গবেষণা ভ্যাণ্ড-টিচেনারের নব-প্রতিষ্ঠিত মনস্তাত্ত্বিক রূপের সর্বজন-গ্রাহ্যতা সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি করল। টিচেনার কিন্তু একদিনের জন্যও এই যুক্তিকে মেনে নিতে পারেন নি। তাঁর মতে হয়তো গবেষণাগারিক পদ্ধতির অভাব কিংবা অন্তর্দৃষ্টির শিক্ষার অভাব, কিংবা অন্য কিছু আমাদের এই বিষয়ে প্রলুব্ধ করেছে এবং তারই ফলে চিন্তাকে মানসিক প্রক্রিয়ার আর একটি মৌলিক উপাদান হিসাবে কল্পনা করা হয়েছে। কিন্তু সব দিক্ বিচারে টিচেনার দেখালেন চিন্তা যদি কোনও সুসংবদ্ধ মানসিক প্রক্রিয়া হয় তবে তা অন্যান্য প্রক্রিয়ার মতই গঠিত হয়েছে উপরোক্ত মৌলিক ভাব-সমষ্টি দিয়েই।

সাধারণ বিচারে উর্জবার্গ সম্প্রদায় এবং টিচেনারের মধ্যে বিরাট্ পার্থক্য দৃষ্ট হয়। কিন্তু আজকের বিচারে এই ধরনের পার্থক্যকে পার্থক্য না ব'লে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী বলতে পারা যায়। টিচেনার যেখানে চিন্তাকে বলেছেন "কিছুর" সমষ্টি, সেখানে উর্জবার্গ সম্প্রদায় দেখালেন মৌলিকত্ব। কিন্তু চিন্তার

গঠনচয়ে সকলেই সংজ্ঞাত প্রতিন্যাসকে স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। প্রতিন্যাস বাস্তব বিচারে নির্জ্ঞাত মননের প্রাচযিক পরিচয় শূন্য নয়—তাই সংজ্ঞাত পরিচয়ে সে রূপ নেয় কোনও প্রতিরূপ অনুভূতি বা সংবেদনের সমষ্টিবদ্ধতার উপর নির্ভর ক'রে। কিন্তু তাই বলে এই সমষ্টিবদ্ধভাবই যে প্রতিন্যাসের কাঠামো এ কথা বলা ভুল। তাই চিন্তার গবেষণাগারিক পরিচয়ে টিচেনার বা উর্জবার্গ সম্প্রদায় উভয়েই নতুন আলোর সন্ধান দিয়েছেন। পার্থক্য যা দৃষ্ট হয় তা হচ্ছে দৃষ্টিভঙ্গীর প্রচণ্ড অমিলের জন্য—ভাব বা বিষয়ে নয়।

এই পর্যায়ের আরও একটি গবেষণাগারিক-রূপ দেখতে পাওয়া যায় অটো সেলজ-এর (Otto Selz) কাজের মধ্যে। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল চিন্তার পরিচয়ে সম্পূর্ণরূপে association মতবাদকে অস্বীকার এবং উর্জবার্গ সম্প্রদায়ের গবেষণায় যে সমস্ত মৌলিক প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছিল সেগুলির সমাধান করা। তিনি দেখালেন প্রত্যেক চিন্তার মাঝে এমন একটা রূপ থাকে, যা আছে এবং বোঝা যায়, যে সম্পর্কে আছে তাও জানা যায় এবং কি হবে বা হ'ল তাও অনুভূত হয়। কিন্তু তা ব'লে এগুলি কোনও বাস্তব প্রত্যক্ষ বা তার প্রতিরূপ নয়—এগুলি একটি সম্পর্কায়িত জ্ঞান।

বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক মিনং (Meinong) এই ধরনের সম্পর্কায়িত জ্ঞানের কথা প্রথম তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীতে অনুধাবন করেন। যদি আমরা বলি শ্রী 'ক' শ্রী 'খ'-এর পিতা, আমাদের মনে "ক" এবং "খ" উভয়ের সম্বন্ধেই আলাদা আলাদা ধারণা হবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁদের মধ্যে যে একটি বাস্তব সম্পর্ক আছে যা সাধারণ প্রত্যক্ষে দৃষ্ট হয় না অথচ এ সম্পর্কে আমাদের একটা জ্ঞান আছে এই রকম একটি ধারণার সৃষ্টি করবে। এই বিভিন্নতার মাঝে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো যে সম্পর্কায়িত জ্ঞান আমাদের থাকে এবং অহরহ সৃষ্ট হয়, তাই চিন্তার রূপ। সেলজ্-এর মতে প্রত্যেক ব্যক্তিই এই ধরনের জ্ঞান তার জীবন-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন প্রত্যক্ষের মাধ্যমে আহরণ করে। পারিপার্শ্বিক সম্ভাব্যতার সম্মুখীন হলে এই জ্ঞানের পূর্ণ রূপ অনুভূত হয়—অন্য সময়ে সেগুলি সৃষ্টি হবার পরেই মনের সুপ্ত স্তরে অবস্থান করে। আরও বৈশ্লেষণিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করলে দেখা যায়, প্রথমে এই ধরনের জ্ঞান আংশিক পরিচয়ে উদ্দীপক প্রভাবে আহরিত হয়। সেগুলি মস্তিষ্কের বিভিন্ন লোকের যুগ্ম প্রক্রিয়ার সাহায্যে বিভিন্নতার মাঝে একক সম্পর্ক স্থাপনে সচেষ্ট হয়। তখন এগুলি সাময়িক ভাব ত্যাগ ক'রে অতীতের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে একটি পূর্ণ রূপ নেয়। এইগুলিকেই সেলজ বলেছেন সম্পর্কায়িত মিশ্রজ্ঞান।

প্রায়োগিক মনোবিদ্যার এই বিরাট্ অনুধাবন ক্রমশঃ আবার দর্শনের সংযুক্তি চাইল। এই সম্পর্কায়িত মিশ্রজ্ঞানের পূর্ণতার দার্শনিক (ভাবাত্মক) কারণ কী? কী সেই শক্তি যার প্রভাবে অতীত ও বর্তমান মিলে যায়, ভবিষ্যতের আশা ভরিয়ে তোলে মনকে? অত্যন্ত জটিল প্রশ্ন সন্দেহ নেই। কিন্তু যে মনোবিদ্যার সূচনা হয়েছিল এই ধরনের বাস্তবতা-বর্জিত দার্শনিক ভাবানুকরণের সম্পর্ক-ত্যাগে তা কি আবার ফিরে যাবে সেই বিরাট্ জিজ্ঞাসার মধ্যে। তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই—অত্যন্ত ছোট একটি উদাহরণ: ধরা যাক ছোট ছেলেদের ভূগোলের মৌখিক পরীক্ষা হচ্ছে। জিজ্ঞাসা করা হ'ল আমেরিকার রাজধানীর নাম কি? ছাত্রটি অনেক দেশের অনেক রাজধানীর নাম কণ্ঠস্থ করেছে—সে জানে—তার মাথায় জট পাকিয়ে এল, সে কিন্তু কিছু বলতে পারল না। যদি পরীক্ষকটি ভাল হন, তিনি যদি সত্যি জ্ঞানের পরীক্ষা করতে বসে থাকেন, তিনি বুঝতে পারবেন ছেলেটির কোথায়

অসুবিধা হচ্ছে। তিনি বললেন "ও"—না তাতেও হ'ল না—"ওয়া" উহু;—"ওয়াশ্……। "ওয়াশিংটন, স্যার!" কোথা থেকে পেল ছেলেটি? পূর্বতন জ্ঞানের সঙ্গে বর্তমান কাজের মিশ্রতা সৃষ্টির প্রচেষ্টার মাধ্যমে এই পূর্ণতাবোধের সৃষ্টি হ'ল। সেল্‌জ্ এই ভাব বিশ্লেষণে তিনটি সূত্রের সন্ধান দিলেন :—

১। কোনও মিশ্রাংশ যদি, পূর্ণতার পরিচয়ে কর্মক্ষেত্রে আসে তবে তা অপরাপর অংশগুলিকে সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত করার চেষ্টা করে;

২। কোনও যোজনা যখন কোনও মিশ্রাংশের আবহরূপে প্রতিভাত হয়, তখন সেই যোজনা সেই যুগ্মাংশের অপরাপর অংশগুলিকে সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত করার চেষ্টা করে;

৩। যদি কোনও ইচ্ছা, কোনও প্রতিভাত মিশ্রতার অংশ সম্পর্কিত সমস্যা সমাধানে ব্রতী হয়, তবে সেই ইচ্ছা সেই যুগ্মতার অপরাপর অংশগুলিকেও সম্পূর্ণরূপে সমাধানে প্রবৃত্ত হবার প্রচেষ্টা করে।

এই সম্পর্কায়িত মিশ্রজ্ঞান প্রতিরূপহীন। চিন্তার প্রতিটি স্তরে, সম্পর্কায়িত মিশ্রজ্ঞান কাজ ক'রে চলেছে। কোনও সময়ে এর পূর্ণতা লাভ হচ্ছে, কোনও সময়ে মিশ্রজ্ঞানের বিভিন্ন অংশের মধ্যে প্রতিভাত যোজনার অভাবে পূর্ণতা লাভ করতে পারছে না।

সেল্‌জ্-এর এই সম্পর্কায়িত মিশ্রজ্ঞান প্রক্রিয়া ওয়াট-এর 'ইচ্ছা'র ন্যায়ই কর্মকেন্দ্রিক। কিন্তু এটা কেবল ইচ্ছা নয়। ভাবহীন-উদ্দীপক যেমন কোনও কোনও চিন্তার আশ্রয় দিতে পারে না, তেমনই উদ্দীপক-বর্জিত চিন্তার কোনই মূল্য নেই। ভাবযুক্ত-উদ্দীপক ইচ্ছার সৃষ্টি করে বা নির্দিষ্ট ইচ্ছার নির্বাচন করে। সেইমত চিন্তার সৃষ্টি হয় 'উদ্দীপক-ইচ্ছা'-নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে।

চিন্তার প্রকৃতি-নির্ণয়ে সেল্‌জ্-এর এই গবেষণার মধ্য দিয়ে আমরা বহির্জগৎ এবং অন্তর্জগতের সম্পর্ক নির্ণয়ে চিন্তাশক্তির যৌগিক মূল্যমান সম্পর্কে অনেক কথাই জানতে পারি। এই পরিচয়ের পূর্ণতা-প্রাপ্তি সম্ভব হয়েছিল গেস্টাল্ট্ (Gestalt) সম্প্রদায়ের গবেষণার মাঝে। অবশ্য এর মাঝেও একটি প্রশ্ন থাকে—ব্যক্তি-প্রকৃতিতে চিন্তার স্বরূপ জানা। সেই প্রশ্নের সমাধান সম্ভব মনোবৈশ্লেষনিক গবেষণায়। ভবিষ্যতে এই দুই মহতী চিন্তাধারার বিচারে চিন্তার প্রকৃতি নির্ণয়ের ইচ্ছা রইল।

মনঃসমীক্ষণের তাৎপর্য

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, এম.এ., এল্‌এল. বি. *

মনঃসমীক্ষণ কথাটা আজকাল অল্পবিস্তর সকলেরই পরিচিত। কেবল মনোবিদ্যার ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে এর প্রচলন সীমাবদ্ধ নয়। সমাজ ও সংস্কৃতির বহুক্ষেত্রেই এর প্রভাব আজ স্বীকৃত। চিকিৎসক, সাহিত্যিক, সমালোচক, শিল্পী, সমাজবিৎ, নীতিবিৎ এবং শিক্ষাব্রতী, সকলেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে মনঃসমীক্ষণের প্রভাব নিয়ে বর্তমানে চিন্তা ক'রে থাকে। সাহিত্য ও কলাসৃষ্টির ব্যাপারে নির্জ্ঞান মনের, তথা অবদমিত চাহিদার, প্রভাব কতটা? সমাজ ও নীতি-বিরোধী কাজে মানুষের মনের-বিকৃতি কতটা প্রভাব বিস্তার করে এবং তার প্রতিকারের উপায় কী? এমনি মনঃসমীক্ষণ-বিষয়ক নানা সমস্যা নিয়ে আজ আলাপ-আলোচনার অন্ত নেই। আর এই আলোচনার সঙ্গে স্বতঃই জড়িত হয়ে থাকে সিগ্‌মুণ্ড ফ্রয়েডের নাম। এর কারণ, মনঃসমীক্ষণের আবিষ্কার ও এর সার্থক রূপায়ণের পিছনে রয়েছে ফ্রয়েডের সারাজীবনের সাধনা। পদার্থবিদ্যায় ও জীববিদ্যায় নিউটন, কেপলার, গ্যালিলিও, আইনষ্টাইন ও ডারুইনের নাম যেমন অবিস্মরণীয়, মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে ফ্রয়েডের নামও তেমনি অবিস্মরণীয়।

মনঃসমীক্ষণ এবং মনোবিদ্যা (psycho-analysis and psychology) কিন্তু সমার্থক শব্দ নয়। মনঃসমীক্ষণ মনোবিদ্যার একটা শাখা মাত্র। অ্যারিষ্টটল থেকে আরম্ভ ক'রে আজকের দিনের সকল মনোবিদের মনোবিষয়ক বিভিন্ন তথ্য আবিষ্কারের সাহায্যে গড়ে উঠেছে যে-বিজ্ঞান তাকেই সমগ্রভাবে মনোবিদ্যা বলা হয়। আর বিশেষভাবে ফ্রয়েডের প্রচেষ্টায় যে মনোবিদ্যা গ'ড়ে উঠেছে তাকে বলা হয় মনঃসমীক্ষণ। Psycho-analysis বা মনঃসমীক্ষণের বুৎপত্তিগত অর্থ হ'ল মনের বিশ্লেষণ। কাজেই সেদিক থেকে দেখলে মনে হবে যে, যে-বিজ্ঞান মনকে বিশ্লেষণ ক'রে থাকে তাকেই মনঃসমীক্ষণ বলে। কিন্তু এই বুৎপত্তিগত অর্থ দিয়ে মনঃসমীক্ষণের ধারণা একটুও পরিষ্কার হয় না। কারণ মনোবিদ্যার সকল শাখাই তো মনের স্বরূপ জানতে গিয়ে অল্পবিস্তর মনকে বিশ্লেষণ ক'রে থাকে। তাই ব'লে কি সকলকেই মনঃসমীক্ষণ বলব? তা বলা চলে না। মনঃসমীক্ষণ কথাটা একটা বিশেষ অর্থেই ব্যবহৃত হয়। মনোবিদ্যার অন্যান্য শাখা (যেগুলো মনকে বিশ্লেষণ করে) যে-মনকে বিশ্লেষণ করে তা হ'ল সজ্ঞান বা চেতন মন (conscious mind)। কিন্তু মনঃসমীক্ষণের কাজ সজ্ঞান মন নিয়ে নয়; এর কাজ নির্জ্ঞান বা অবচেতন মন (unconscious mind) নিয়ে। এই নির্জ্ঞান মনকে আয়ত্তের মধ্যে এনে তাকে বিশ্লেষণ ক'রে তার স্বরূপ জানা এই হ'ল মনঃসমীক্ষণের উদ্দেশ্য। কাজেই মনঃসমীক্ষণ করার যে বিশেষত্ব তা নিহিত রয়েছে এই নির্জ্ঞান মনকে বিশ্লেষণ করার মধ্যে। এবং এই বিশেষ অর্থেই মনঃসমীক্ষণ কথাটা ব্যবহৃত হয়; বুৎপত্তিগত অর্থে নয়।

এ ছাড়া আবার মনঃসমীক্ষণ কথাটা ব্যাপ্তি অনুযায়ী দু' অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ব্যাপক অর্থে এবং সংকীর্ণ অর্থে। ব্যাপক অর্থে, ফ্রয়েড আবিষ্কৃত মনোবিষয়ক সকল তথ্য ও তত্ত্বকে সমগ্রভাবে নিয়ে যে-মনোবিদ্যা গ'ড়ে উঠেছে তাকেই মনঃসমীক্ষণ বলে। এই ব্যাপক অর্থে মনঃসমীক্ষণ একটি মনোবিদ্যা বা মনোবিজ্ঞান; আর সংকীর্ণ অর্থে মনঃসমীক্ষণ বলতে বোঝায়, মানসিক ব্যাধির চিকিৎসার ব্যাপারে ফ্রয়েড যে বিশেষ পদ্ধতি ব্যবহার করতেন সেই পদ্ধতিকে। সংকীর্ণ অর্থে

* দর্শনশাস্ত্রের উপাধ্যায়, স্কটিশ চার্চ কলেজ, কলিকাতা

মনঃসমীক্ষণ একটা পদ্ধতি (method) মাত্র। কাজেই মনঃসমীক্ষণ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা পেতে হলে ব্যাপক ও সংকীর্ণ দুটো অর্থেই বিষয়টা বুঝতে হবে।

প্রথমে ব্যাপক অর্থটা বোঝা যাক। এর জন্য যে-তত্ত্ব ও তথ্যকে ভিত্তি ক'রে ফ্রয়েডীয় মনোবিদ্যা দাঁড়িয়ে আছে সেগুলোকেও বোঝা দরকার।

ফ্রয়েডের প্রথম ও প্রধান কথা হ'ল বস্তুজগতের মতো মনোজগৎও অমোঘ কার্য-কারণ নিয়মে (causation) পরিচালিত। এই মানস-নিয়ন্ত্রণবাদ (psychic determinism) অনুযায়ী বাস্তবজগতের মতো মনোজগতেও আকস্মিকতার (chance) কোনও স্থান নেই। মনোজগতে যা ঘটছে তা যতই তুচ্ছ ও অর্থহীন বোধ হ'ক না কেন, আসলে তার পিছনেও যথেষ্ট অর্থ বা কারণ আছে। যেমন স্বপ্ন, বিস্মৃতি-প্রবণতা (forgetfulness), লেখার ভুল (slip of pen), বলার ভুল (slip of tongue), ব্যক্তি বিশেষের অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গী বা হাস্যাস্পদ আচরণ ইত্যাদি ঘটনা যদিও অকারণ মনে হয়, তবুও তাদের বিজ্ঞানসম্মত যথেষ্ট কারণ আছে; কেবল সে কারণ আমাদের অজ্ঞাত। এ কারণগুলো হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন ইচ্ছা। ইচ্ছার অধিকাংশই যেহেতু আমাদের অজ্ঞাত তাই তাদের পরিচয় পেতে হলে সংজ্ঞান মনের গণ্ডির বাইরে তাদের সন্ধান করতে হবে—নির্জ্ঞান মনের মধ্যে। এই নির্জ্ঞান মনের প্রত্যয় ফ্রয়েডের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ অবদান।

স্বপ্ন-বিশ্লেষণ, (dream analysis), অবাধ ভাবাহুষঙ্গ (free association) ও মানসিক রোগীদের বিভিন্ন লক্ষণ (symptoms) বিশ্লেষণ ক'রে ফ্রয়েড আবিষ্কার করেছেন যে, মানুষের যে-মনের সংস্পর্শে আমরা সাধারণতঃ আসি বা যে-মন আমাদের কাছে ব্যক্ত তা মনের সবটা নয় এবং সে-মন ব্যক্তির সম্পূর্ণ পরিচয় বহন করে না। এই যে ব্যক্ত সংজ্ঞান মন (conscious mind) এর পিছনে রয়েছে এক গভীর মনোরাজ্য। মোটামুটি বলা চলে, মনের $\frac{1}{10}$ ভাগ সংজ্ঞান ও $\frac{9}{10}$ ভাগ নির্জ্ঞান। সমুদ্রে ভাসমান হিমশৈলের মতো মনের $\frac{1}{10}$ ভাগ উপরে ভেসে আছে অর্থাৎ সংজ্ঞান, এবং $\frac{9}{10}$ ভাগ নিম্নে নিমজ্জিত অর্থাৎ নির্জ্ঞান। আসলে এই নির্জ্ঞান মনই সংজ্ঞান মনকে চালিত করে এবং ব্যক্তির আচার-ব্যবহার, পছন্দ-অপছন্দ, কর্মক্ষমতা ও স্বভাব-চরিত্র—সমস্তই এই নির্জ্ঞান মনের অবস্থার উপর নির্ভরশীল। সমগ্র মানসিক শক্তির (mental energy) উৎস এই নির্জ্ঞান মন; আমাদের শক্তিশালী ইচ্ছা, প্রেরণা, প্রক্ষোভ ইত্যাদির আবাসভূমি এই নির্জ্ঞান রাজ্য। এই নির্জ্ঞানস্থিত বিভিন্ন মানসিক শক্তির সামঞ্জস্যের উপরই নির্ভর করে ব্যক্তির মানসিক সুস্থতা ও অসুস্থতা।

এ ছাড়া নির্জ্ঞান মনের নিজস্ব কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। সংজ্ঞান মন বাস্তববাদী ও বিচারবাদী, কিন্তু নির্জ্ঞান মনে বাস্তবতা বা যুক্তি-বিচারের কোনও স্থান নেই। সংজ্ঞান মনে নেতিবাচক ও ইতিবাচক—উভয় ধারণাই বর্তমান। কিন্তু নির্জ্ঞানে নেতিবাচক ভাব বা ধারণার কোনও স্থান নেই। নির্জ্ঞানে সকল কিছুই ইতিবাচক (affirmative)। নির্জ্ঞানের এই ইতিবাচক ভাব অনেক সময় সংজ্ঞানে নেতিবাচক রূপে ব্যক্ত হয়। কিন্তু এ তার আসল পরিচয় নয়, এ হ'ল ছদ্মবেশ। এই 'না'-এর নির্জ্ঞানে আসল রূপ 'হ্যাঁ'। যেমন কোনও ব্যক্তি যদি কোনও বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি অস্বাভাবিক ঘৃণা পোষণ করে অর্থাৎ তাকে পরিত্যাগ করতে চায়, বুঝতে হবে নির্জ্ঞান মনে ঐ ব্যক্তি বা বস্তুটি তার চরম কাম্য।

নির্জ্ঞানের ভাষাও বিচিত্র। সেখানে প্রতীকের সাহায্যে ভাবের প্রকাশ। এই প্রতীকগুলোর

অর্থ সংজ্ঞান-মনের অর্থ থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। যেমন সংজ্ঞান মনে সাপ এক প্রকার উক্তি, কিন্তু নির্জ্ঞান মনে সাপ পুরুষ-লিঙ্গের সমার্থক। সংজ্ঞান মনে পাহাড়ের চূড়া অর্থে পাহাড়ের ঊর্ধ্বদেশ, কিন্তু নির্জ্ঞান মনে অবস্থা-বিশেষে পাহাড়ের চূড়া পুরুষ লিঙ্গ বা নারীর স্তনের সমতুল্য। এ ছাড়াও দেখা যায় নির্জ্ঞান মনে সমগ্রের জন্য অংশের ও অংশের জন্য সমগ্রের ব্যবহার। যেমন, সমগ্র মানবদেহ বোঝাতে দেহের যে কোনও একটা অংশই যথেষ্ট। আবার তেমনি কোনও বিশেষ অংশের বদলে সমগ্র দেহকেও ব্যবহার করা হয়। নির্জ্ঞানে স্ত্রী বা পুরুষ জননেন্দ্রিয় বোঝাতে সমগ্র পুরুষ বা স্ত্রীলোকের মূর্তি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। স্বপ্নে, অতিকথায় (myth) বা রূপকথায় (fairy tales) এর বহুল প্রকাশ দেখা যায়।

মনঃসমীক্ষণের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার, অবদমন ও মানসিক প্রতিবন্ধ (repression and resistance)। নির্জ্ঞান মনে যে-প্রবৃত্তিসমূহ বাস করে তারা সহজভাবে সংজ্ঞানে আসতে পারে না। তাদের সংজ্ঞানে আনতে চেষ্টা করলে সংজ্ঞান-মন তাতে বিশেষ বাধা দেয়। মনের এই ক্রিয়াকে বলা হয় প্রতিবন্ধ বা resistance আর প্রবৃত্তি-সম্ভাত চাহিদা নিচয়কে নির্জ্ঞান রাজ্যে বন্দী ক'রে রাখার ব্যাপারকে বলা হয় repression বা অবদমন। মনঃসমীক্ষণ করতে গিয়ে ফ্রয়েড দেখেছেন যে অবদমিত ইচ্ছাকে সংজ্ঞানে আনতে হলে মনের প্রতিবন্ধশক্তির সঙ্গে প্রবল লড়াই করতে হয় এবং শেষপর্যন্ত তাকে পর্যুদস্ত ক'রে তবেই নির্জ্ঞান-মনের সামগ্রীর সঙ্গে ব্যক্তির প্রত্যক্ষ পরিচয় করানো সম্ভব হয়। আরও দেখা গেছে যে, ব্যক্তির অবদমিত-চাহিদার শক্তি যত প্রবল তার প্রতিবন্ধশক্তিও তত প্রবলভাবেই মনে কাজ করে। মানসিক চিকিৎসার ব্যাপারে তাই এই প্রতিবন্ধকে অতিক্রম করার জন্য সমীক্ষককে যেমন নৈপুণ্য প্রয়োগ করতে হয়, রোগীকেও তেমনি সমূহ পরিশ্রম করতে হয়। আসলে এ ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে নিজের সঙ্গেই নিজেকে লড়াই করতে হয়।

ফ্রয়েডের চতুর্থ গুরুত্বপূর্ণ কথা এই যে, মানুষের চরিত্র এবং ব্যক্তিত্ব-গঠন ব্যাপারে তার যৌনজীবন বহুমাত্রায় প্রভাবশীল এবং তার যৌনজীবনের আবির্ভাব হয় অতি শৈশবেই। অনুসন্ধানের ফলে দেখা গেছে, "Among the repressed impulses that constituted one-half of the unconscious conflict sexual ones are predominant..... .....A much larger proportion of the sexual instinct leads an underground life than is generally imagined, and the energy derived from it has a peculiar capacity for being transferred to other interests, the result being that an unexpected amount of our conscious activities are in part dependent on repressed sexual impulses."[১] ব্যক্তির যৌন-জীবন গঠনে যে-যৌনশক্তি বা কামশক্তি ক্রিয়াশীল ফ্রয়েড তার নাম দিয়েছেন "লিবিডো" (libido)। "লিবিডো" কথার অর্থ কামশক্তি। কথাটি কিন্তু অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহার হয়। কারণ যৌনতা বা কামশক্তি ফ্রয়েডের মতে অতি ব্যাপক জিনিস। যৌনতা মানেই লৈঙ্গিক বা জননেন্দ্রিয়জাত আবেগ নয়। কারণ চুম্বনও কামক্রিয়া। কিন্তু চুম্বনের সঙ্গে তো লিঙ্গের কোনও সংশ্রবই নেই! যা আরামদেয় তাই libido বা কাম। খেয়ে মুখে আরাম পাওয়া যায়, কেউ গায়ে হাত বোলালে আরাম পাওয়া যায়, প্রস্রাব, পায়খানা ক'রে আরাম পাওয়া যায়—কাজেই এই সমস্ত ক্রিয়া থেকে উদ্ভূত আরামকেই ফ্রয়েড কাম বলেছেন।

১ E. Jones, *What is Psychoanalysis?* p. 22.

এই কাম অতি শৈশবেই দেখা দেয়, এবং বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এই কামশক্তি পূর্ণ পরিণতি লাভ করে। বিভিন্ন স্তরগুলোর নাম যথাক্রমেঃ স্বতঃকাম (auto-eroticism), স্বকাম (Narcissism) এবং অপরকাম (allo-eroticism)। অপরকামের আবার দুভাবে প্রকাশ—সমকাম (homosexuality) ও ইতরকাম (heterosexuality)। এই ইতরকামের প্রকাশের সময় শিশু তার কামপ্রবৃত্তি বিপরীত-লিঙ্গের ব্যক্তির উপর স্থাপন ক'রে থাকে। পুরুষ-শিশুর বেলায় তার ইতরকামী প্রথম বিপরীত লিঙ্গের পাত্রী তার মা এবং স্ত্রী-শিশুর বেলায় সেই পাত্র তার বাবা। পুরুষ-শিশুর তার মা'র প্রতি এই কামজ আকর্ষণকে বলা হয় ইডিপস্ ভালবাসা এবং স্ত্রী-শিশুর তার বাবার প্রতি আকর্ষণকে বলা হয় ইলেকট্রা ভালবাসা। ফ্রয়েডের মতে যদি কামশক্তি এই বিভিন্ন স্তরের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সম্পূর্ণ প্রস্ফুরিত হতে পায় তবেই ব্যক্তির মানসিক সুস্থতা জন্মায়। আর কামশক্তি কোনও এক বিশেষ কামস্তরে প্রতিহত (inhibited) হলে, সেই বিশেষ স্তর অনুযায়ী বিভিন্ন মানসিক অসুস্থতা দেখা দিতে পারে।

ফ্রয়েডের আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হ'ল মনের ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি। আচরণের দিক থেকে দেখা যায় যে, মন তিন রকম ভাবে ব্যবহার করে। এই তিন প্রকৃতি যথাক্রমে—প্রবৃত্তিমূলক, বাস্তবমূলক ও নীতিমূলক। মনের এই ত্রিধা প্রকাশের নাম যথাক্রমে (১) অদস্ (id), (২) অহম (ego), (৩) অধিশাস্তা (super-ego)। অদস্ হ'ল মনের প্রবৃত্তিমুখিতা—কোথায় আরাম আছে তারই সন্ধান ও ভোগের প্রবৃত্তি। বাস্তবে তা মিলবে কি মিলবে না, অথবা তা সমগ্র ব্যক্তিত্বের পক্ষে ভাল হবে কি মন্দ হবে সে বিচার এখানে ওঠে না। যা চাই তা পেতে হবে—এমনি ছেলেমানুষী-চাওয়া। অহম্ বাস্তবানুগ। বাস্তবের সম্ভাবনা বা অসম্ভাবনা সে বোঝে, এবং বাস্তব দেখে প্রবৃত্তিকে চালিত করতে চেষ্টা করে। অধিশাস্তা হ'ল মনের নীতি-বিভাগ; এখানে উচিত অনুচিতের প্রশ্ন ওঠে এবং আদর্শের দিকে লক্ষ রেখে ব্যক্তির কাজকর্মকে নিয়ন্ত্রণের অনুশাসন জারী হয়।

মনঃসমীক্ষণের যষ্ঠ উল্লেখযোগ্য বিষয়ঃ মনের দ্বান্দ্বিকতা বা মনের মধ্যে পরস্পর-বিরোধী প্রবৃত্তির একত্র অবস্থান। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, জীবন প্রবৃত্তি ও মরণেচ্ছার (life instinct and death instinct) সহ-অবস্থান। আমাদের মধ্যে যেমন বাঁচবার ইচ্ছা আছে, তেমনি মরবার ইচ্ছাও আছে। মরণেচ্ছার প্রাবল্য হলে মানুষ আত্মধ্বংসী কাজকর্ম করে এবং আত্মহত্যাও ক'রে থাকে; ফ্রয়েড মনে করেন, আমাদের এই জীবন প্রবৃত্তি ও মরণেচ্ছার একটা আপোষ-রফা হ'ল নিদ্রা। নিদ্রায় আমরা জীবন হারাই না অথচ মরণের অনেক বৈশিষ্ট্যও সেখানে বর্তমান। মানুষ সহজভাবেই বোধহয় এ সত্য উপলব্ধি করেছে তাই তার ভাষাব্যবহারে মৃত্যু 'চিরনিদ্রা' (eternal sleep) নামে আখ্যাত।

এ ছাড়াও দেখা যায় মনের মধ্যে সুখসূত্র ও বাস্তবসূত্রের মধ্যে বিরোধিতা বর্তমান। সহজভাবে আমরা আরাম চাই। কিন্তু কেবল আরামে গা ঢেলে দিলেও চলে না। তাই জীবনে অনেক আরামকেই বিসর্জন দিয়ে বাস্তব মেনে চলতে হয়। কাজেই দেখা যায় যে পরস্পর-বিরোধী প্রবৃত্তির মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা ক'রেই জীবন চালিত।

উপরল্লিখিত তথ্যগুলি এবং আরও ছোটবড় নানা তথ্য ও তত্ত্ব নিয়ে ফ্রয়েডের মনোবিদ্যা গ'ড়ে উঠেছে। ফ্রয়েড-সৃষ্ট এই মনোবিদ্যাকেই ব্যাপক অর্থে মনঃসমীক্ষণ বলা হয়।

এখন দেখা যাক মনঃসমীক্ষণের দ্বিতীয় ও সংকীর্ণ অর্থটা কি। সংকীর্ণ অর্থে দেখেছি মনঃসমীক্ষণ

হ'ল মনের চিকিৎসা ব্যাপার। ফ্রয়েডের মনোবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য যে কেবল মন সম্বন্ধে তাত্ত্বিক জ্ঞান দেওয়া তা নয়। মন সম্বন্ধে নানা খুঁটিনাটি জ্ঞান সংগ্রহ করা এবং মন অসুস্থ হলে তাকে সুস্থ করা—এ দুইই মনঃসমীক্ষণের উদ্দেশ্য। কেবল এই দ্বিতীয় উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ করলে মনঃসমীক্ষণকে চিকিৎসাবিজ্ঞান বা চিকিৎসা পদ্ধতিও বলা চলে। মনের চিকিৎসা করতে গিয়ে ফ্রয়েড বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করতেন এবং তার দ্বারা চিকিৎসা ক'রে রোগ উপশম করতেন। সে-পদ্ধতি হ'ল অবাধ ভাবানুষঙ্গ এবং স্বপ্ন-বিশ্লেষণ।

আগেই দেখেছি নির্জ্ঞান মনে আমাদের জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ জুড়ে আছে। আমাদের সমস্ত কামনা-বাসনার উৎস এই নির্জ্ঞান মন। শিশুর কামজীবন যখন গ'ড়ে ওঠে তখন তার কোনও কামনা বা আবেগ নানা বাধা পেয়ে অতৃপ্ত থেকে যেতে পারে। এই অতৃপ্ত বাসনা কিন্তু কখনও নিঃশেষ হয়ে মরে যায় না। তারা অতৃপ্ত অবস্থাতেই নির্জ্ঞান মনে বাস করে। যদি এই অতৃপ্ত কামনা খুব শক্তিশালী না হয় তা হলে সে নির্জ্ঞানেই মোটামুটি পড়ে থাকে এবং সজ্ঞান মনকে বিপর্যস্ত করে না। কিন্তু এ কামনা খুব শক্তিশালী হলে সে নিষ্ক্রিয়ভাবে নির্জ্ঞানে পড়ে থাকে না। তখন সে-ইচ্ছা জোর ক'রে সজ্ঞান মনে চড়াও হয়ে তার তৃপ্তি খোঁজে। কেউ খোলাখুলি ভাবে এ ইচ্ছাগুলো আত্মপ্রকাশ করতে পারে না। কারণ ইচ্ছাগুলো সাধারণতঃ যৌনইচ্ছা। আর যৌনতার উপর সমাজের শাসন অতি প্রবল। শৈশব থেকেই সমাজের এই শাসন মনের মধ্যে ঢুকে সৃষ্টি করে সমাজবোধ। এর প্রভাবে শৈশবের যৌন-চাহিদাকে খারাপ, অন্যায় ভাবতে শিখি। এই শিক্ষার দরুনই আবার যৌন-চাহিদাগুলোর প্রতি আমাদের বিপরীত আবেগ যেমন ঘৃণা, লজ্জা, ভয় প্রভৃতি জন্মায়। এর ফলে শৈশবের যৌন-চাহিদা আর খোলাখুলি ভাবে ভোগকরা সম্ভব হয় না। কিন্তু ইচ্ছা নানাভাবে তৃপ্তি খোঁজে; ফলে, মনে দ্বন্দ্বের (conflict) সৃষ্টি হয়। একদিকে ইচ্ছার টান, অপরদিকে সমাজবোধ। এর দরুন বিভিন্ন লক্ষণ সৃষ্টি ক'রে দেখা দেয় মানসিক অসুস্থতা। মানসিক রোগ এই প্রেয় ও শ্রেয়র মধ্যে যেন একটা আপোষ-রফা বা সন্ধিজ প্রক্রিয়া (compromise formation)। ফ্রয়েড তাই মানসিক রোগকে ঘোরানো-পথে ইচ্ছা-পূরণ বলেছেন।

যেহেতু চাহিদাগুলো নির্জ্ঞান মনে বাস করে তাই এদের সন্ধান করতে নির্জ্ঞান মনে ঢুকতে হয়। এই নির্জ্ঞানের তথ্য সংগ্রহের জন্যেই ফ্রয়েড অবাধ ভাবানুষঙ্গ ও স্বপ্নবিশ্লেষণ পদ্ধতির সাহায্য গ্রহণ করেন। চিকিৎসার সময় রোগীকে আরাম-চেয়ারে শরীর ঢিলে ক'রে বসিয়ে তার মন ছেড়ে দিয়ে যা মনে আসে তাই বলতে নির্দেশ দেওয়া হয়। মনকে এমনি ভাবে ছেড়ে দিয়ে কথা বললে মনের গভীরস্থ আবেগের নানা ইঙ্গিত কথার স্রোতে ভেসে আসে। আপাতদৃষ্টিতে কথাগুলো অসঙ্গত ও অর্থহীন মনে হয়। কিন্তু বিচক্ষণ সমীক্ষক এদের অর্থ বোঝেন। তিনি রোগীর কাছে এই অর্থ পরিষ্কার ক'রে দেন, এবং তার চাহিদা অনুযায়ী মনকে চালনা করবার নির্দেশ দেন। স্বপ্নের মধ্যেও নির্জ্ঞান মনের চাহিদা নানা ছদ্মবেশ ধ'রে (symbolically) আত্মপ্রকাশ করে। স্বপ্ন আমাদের কাছে অর্থহীন ঠেকলেও, মনঃসমীক্ষণের ইঙ্গিতে স্বপ্ন গূঢ় অর্থপূর্ণ ব্যাপার। রোগীর স্বপ্ন প্রয়োজন মতো বিশ্লেষণ ক'রে তার অন্তর্নিহিত অর্থ সমীক্ষক রোগীর কাছে সুস্পষ্ট ক'রে দেন। অবাধ ভাবানুষঙ্গ ও স্বপ্নলব্ধজ্ঞানে নির্জ্ঞান মনের খবর পেয়ে এবং অতৃপ্ত ইচ্ছার সন্ধান পেয়ে কল্পনায় তা ভোগ ক'রে রোগী সুস্থ হয়ে ওঠে। ইচ্ছার এই প্রকার ভোগ পূর্ণ হলে মনের দ্বন্দ্ব দূর হয়। মন তখন উত্তেজনামুক্ত হয়ে স্বাভাবিক

কাজকর্মে রত হতে পারে। এমনি ক'রে চলে ফ্রয়েডীয় পদ্ধতিতে অসুস্থ মনের চিকিৎসা ও রোগমুক্তি।

অবাধ ভাবানুষঙ্গ ও স্বপ্ন-বিশ্লেষণের দ্বারা মনের যে-চিকিৎসা করা হয় তাকেই সংকীর্ণ অর্থে মনঃসমীক্ষণ বলা হয়। আসলে মনঃসমীক্ষণ কিন্তু কেবল চিকিৎসা ব্যাপার নয়। অনেকের ধারণা ফ্রয়েডের মনোবিদ্যা বা মনঃসমীক্ষণ কেবল অসুস্থ এবং অস্বাভাবী মন নিয়েই কারবার করে এবং এর আবিষ্কৃত সকল তথ্য অসুস্থ ব্যক্তিদের পক্ষেই প্রযোজ্য—সুস্থ ব্যক্তিরা সম্পূর্ণ এর আওতার বাইরে। এ ধারণা কিন্তু সত্য নয়। কারণ মনের মৌলিক উপাদান সুস্থ ও অসুস্থ ব্যক্তিত্বে বিভিন্ন নয়; একই। দুটো ক্ষেত্রে কেবল উপাদানগুলোর সামঞ্জস্য ও ক্রিয়ার প্রভেদ। তাই মনঃসমীক্ষণ সুস্থ ব্যক্তিদের পক্ষেও প্রযোজ্য। মনঃসমীক্ষণ একদিকে যেমন চিকিৎসা-পদ্ধতি অপরদিকে তেমনি মনের বিজ্ঞান; যে-বিজ্ঞানে আমরা সহজ ও সুস্থ মনের গঠন, ক্রিয়াকলাপ, তার বিভিন্ন প্রবৃত্তি ও তাদের বহুধা প্রকাশের জ্ঞান পেয়ে থাকি। তাই মনঃসমীক্ষণ সম্বন্ধে পরিষ্কার ও সম্পূর্ণ ধারণা পেতে হলে সংকীর্ণ ও ব্যাপক এ দুটো অর্থেই বিষয়টাকে উপলব্ধি করা দরকার। ফ্রয়েডও এই কথার উপর জোর দিয়ে বলেছেন "……Psycho-analysis began as a therapeutic procedure, but it is not in that light that I wanted to recommend it to your interest, but because of the truths it contains, because of the information it gives about that which is of the greatest importance to mankind, namely, his own nature, and because of the connections it has shown to exist between the most various of his activities.[২]

---

2 S. Freud, *New Introductory Lectures on Psycho-analysis*, p. 201

মৃত্যুভয়

তরুণচন্দ্র সিংহ, ডি. এস্‌সি.*

"জন্মিলে মরিতে হবে,
অমর কে কোথা রবে।"

কবির এই উক্তির সত্যতা সর্ব বয়স্ক লোকই জানেন। আমরা একদিন মরিব এ কথা সহজ ভাবেই বলি। মৃত্যু সম্বন্ধে ঠাট্টা তামাসাও কম করি না। হয়তো বা সুখের কথা এই যে সেই একদিনটা কবে কাহার জীবনে কী ভাবে আসিবে তাহা আমরা জানি না। জানিতে পারিলে কি হইত তাহা বলা সহজ নহে। দুই এক জনের জীবনে নির্দিষ্ট মৃত্যুর দিন জানা থাকায় তাহাদের মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল তাহা পরে বলিব। সাধারণতঃ আমরা নিজেদের বা আপন প্রিয়জনের মৃত্যু, যে-কোনও দিন ঘটিতে পারে মুখে বলিলেও মনে মনে তাহা যেন ঠিক বিশ্বাস করি না। একদিন মরিতে হইবে এ কথা খুব সত্য বলিয়া জানিলেও সেদিন যেন প্রতিদিনই দূরেই থাকিয়া যায়। হিসাবে বা যুক্তিতে আয়ু ক্রমে কমিয়া আসে এ কথা জানিয়াও আমরা কেমন যেন শিশুসুলভ অযৌক্তিক মনোভাবের বশে সেদিনটাকে অনিশ্চিতভাবে দূরে সরাইয়া রাখিতে চাই। এত নিশ্চিত অবধারিত সত্যকে, অপরের জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াও নিজের বেলায় কেন হিসাবের বাহিরে রাখিতে চাই এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নহে। অনেক কথাই বলা যায়, অনেক যুক্তিও দেখানো যায়, তবু সঠিক উত্তর পাওয়া খুবই কঠিন।

অধিকাংশ সাংসারিক মানুষ বয়স বাড়িলে, বৃদ্ধাবস্থায়, সংসারের বিষয়-আশয় সম্বন্ধে তাহার মৃত্যুর পরে উত্তরাধিকারীদের মধ্যে কী ভাবে বিধিব্যবস্থা করা হইবে তাহা আগে হইতে যথাসম্ভব স্থির করিয়া রাখিয়া যাইতে চান। এ অবস্থায় তাঁহারা মরণকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন এ কথা বলা চলিবে কি? এক বিশেষ অর্থে ইহা মানিতে পারা যায়—উল্লিখিত একদিন যে মরিতে হইবে এই কথার উপর ভিত্তি করিয়াই তাঁহারা হুঁসিয়ার হন। তবু নিজের মৃত্যু সত্য সত্যই অতি অল্প দিনের মধ্যেই হইবে এমন কথা নিশ্চিত ভাবে প্রায় কেহই স্বীকার করেন না। কিন্তু সংখ্যায় সামান্য হইলেও এমন মানুষ আছেন এবং ছিলেন যাঁহারা মৃত্যু-সম্বন্ধে প্রায় সঠিক জানিয়াও বিশেষ বিচলিত হন না, বা হন নাই।

মৃত্যুকে আমরা ভয় পাই বলিয়া প্রধানতঃ সে-সম্বন্ধে যথাসম্ভব নিজেকে দূরে সরাইয়া রাখিয়া চলিবার ইচ্ছাই আমাদের প্রবল থাকে। ইহা ছাড়া আরও একটি কারণও দেখা যায়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যে রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শের জগৎ চারিদিকে আমাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে, সেই পরিচিত জগৎ আর আমার থাকিবে না, তাহা হইতে যে-সুখ আনন্দ ও ভোগ প্রতিদিন পাইতেছি সে-সুখ আর পাইব না ইত্যাদি চিন্তা করিতে মন চাহে না। মৃত্যু আমাদের অতি জানা হইয়াও অতি আশ্চর্য রকমের কুহেলিকাময় অজানা। অজানাকে আমরা ভয় করি। এই কারণগুলি একটু বিশ্লেষণ করিলেই দেখা যাইবে আমরা প্রকৃতপক্ষে কিসের ভয় পাই—বা আর বাঁচিয়া থাকিব না এ কথা মনে করিতে চাহি না কেন।

---

* লুথিনি পার্ক হাসপাতালের অধিকর্তা। ভারতীয় মনঃসমীক্ষা সমিতির সচিব। মনঃসমীক্ষক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিদ্যা-বিভাগের অবৈতনিক উপাধ্যায়।

মৃত্যু সম্বন্ধে আমাদের ভয় কোথা হইতে আসিল ? আমরা মৃত্যু সম্বন্ধে যখন ভাবি তখন মৃত্যু প্রকৃত কী তাহা ভাবিতে পারি কি ? মরিবার পরেও আমরা যেন বাঁচিয়া থাকি। অর্থাৎ মৃত্যু সেখানে আমাকে একেবারে কেবল পঙ্গু করিয়া দেয়। ফলে আমার কিছু বলিবার, কিছু করিবার, এমন কি নিজেকে আমার একান্ত আপনজনের কাছে দেখা দিবার ক্ষমতাও থাকে না; কিন্তু আমার দেখিবার শুনিবার বুঝিবার অনুভব করিবার সকল ক্ষমতাই যেন থাকিয়া যায় এই রকমের একটা অস্পষ্ট ধারণা আমরা মনে পোষণ করি। অর্থাৎ মৃত্যু আমাদের কাছে নিরেট মৃত্যু নহে। এখানে হিন্দু মনীষীদিগের কর্মবাদ এবং জন্মান্তরবাদের প্রশ্ন আসিয়া পড়ে। সে-সকল জটিল প্রশ্নের যুক্তি-তর্কের মধ্যে প্রবেশ করিবার ক্ষেত্র ইহা নহে এবং সে-অধিকারও আমার নাই। সুতরাং ঐ সকল দর্শনের তত্ত্বের দিক বাদ দিয়া মনোবিদের দৃষ্টিতে মৃত্যুকে বুঝিতে চেষ্টা করিলে কি দাঁড়ায় তাহাই দেখিতে চেষ্টা করিব। ছোটবেলা হইতেই মানুষ নিজ নিজ সভ্যতা ও কৃষ্টি অনুসারে জীবন ও মৃত্যু সম্বন্ধে নানান রকম বিশ্বাস করিবার শিক্ষা পায়। সে-শিক্ষার প্রভাব অতি প্রবল এবং আমাদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রার মধ্যে নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করে।

জন্মের সময় শিশুর, সময় বা কাল সম্বন্ধে কোনও ধারণাই থাকে না। যত বড় হইতে থাকে তাহার অভিজ্ঞতা হইতে ক্রমে ক্রমে সে সময়ের জ্ঞান লাভ করে। এ অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে বেশ সময় লাগে। মানুষ কেমন করিয়া সময় নির্ণয় করিল তাহা বলা সম্ভব নয়। তবু আদিম অধিবাসী ও গ্রামের অল্পশিক্ষিতদের মধ্যে সময় নির্ণয়ের যে রীতির চলন দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, দিন ও রাতের নিয়মিত আবর্তন হইতে প্রথম সময়ের ধারণা হয়তো জন্মাইতে থাকে। পরে ক্রমে ঋতুর আবর্তন লক্ষ করিতে করিতে বৃহত্তর কালের ধারণা জন্মায়। আবার অন্যদিকে উদয় হইতে অস্ত পর্যন্ত সূর্যের বিভিন্ন অবস্থান এবং রাত্রে আকাশে চাঁদের অবস্থান হইতে ক্রমে দিন ও রাত্রিকে আরও ছোট করিয়া ভাগ করিতে শিখিয়াছে। আসামের পার্বত্য জাতির মধ্যে দেখিয়াছি তাহারা সময় বুঝাইতে হইলে আকাশের সূর্য তখন কোথায় ছিল বা রাত্রিতে চাঁদ তখন কোথায় ছিল তাহাই আঙুল দিয়া দেখাইয়া দেয়। ঘড়ি না থাকায় তাহারা ঘণ্টা মিনিট বা সেকেণ্ডের কোনও ধারণাই করিতে পারে না। দূরত্ব বুঝাইতে হইলেও তাহারা ঐ একই সূর্যের অবস্থান দেখাইয়া বুঝাইয়া দেয়। পূর্বদিকে আকাশে সূর্যোদয়ের সময় রওনা হইলে গন্তব্যস্থানে পৌঁছিতে সময় কত লাগিবে বুঝাইতে হইলে তাহারা গন্তব্যস্থানে পৌঁছিতে সূর্য তখন আকাশের কোথায় থাকিবে তাহাই দেখাইয়া দেয়। আবার ঋতুর মধ্যে প্রধানতঃ গ্রীষ্ম, বর্ষা, আর শীত ইহাই তাহারা বুঝাইয়া দিতে পারিবে। অথবা কোন জিনিস চাষের তখন সময় বা চাষের জিনিসের গাছ তখন কত বড় হয় বা কাটা হয় তাহা উল্লেখ করিয়া বৎসরের সময় বুঝাইয়া দেয়। ঋতুর আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা বৎসর গণনা করে। তাহাদের অন্য দিনপঞ্জিকা নাই। কোনও কোনও ক্ষেত্রে, বিশেষ কোনও অনুষ্ঠান বা উৎসবের সময় হইতে তাহারা সময় হিসাব করে। ৩৬৫ দিনে বৎসর বলিয়া তাহাদের কিছু নাই। এই পুনরাবর্তনে শিশুকাল হইতে আমরা এতই অভ্যস্ত হইয়া যাই যে আর কিছু হিসাব না করিয়াও আজিকার সকালের পরে যে আবার কাল সকাল হইবে তাহা আমরা প্রশ্ন না করিয়া মানিয়া লই। এইভাবে মন ভবিষ্যতের দিকে তাকায়। আজ যাহা করিলাম না কাল তাহা করিব। শিশুর যখন যাহা ইচ্ছা হয় তখনই তাহা পাইতে চায়। কিন্তু বাস্তব জগতে সকল সময় তাহা পূরণ হইতে পারে না। তাহাতে শিশুর ব্যর্থতা-বোধ জাগে;

সে না পাইলে বিরক্তি প্রকাশ করে। অভিজ্ঞতা হইতে সে ক্রমে বুঝিতে শিখে যে চাওয়া ও পাওয়া এক নহে। ইচ্ছা করিলেই পাওয়া যাইবে এমন নাও হইতে পারে। বাস্তব জগৎ শিশুর ইচ্ছা মতো চলে না ইত্যাদি বাস্তব জ্ঞান তাহার গড়িয়া উঠিতে থাকে। এখানে আরও একদিকের কথা উল্লেখ করা দরকার। আজ বীজ বপন করিলে পরে সময় মতো একদিন যে ফসল পাওয়া যাইবে ইহাও অভিজ্ঞতা হইতে শিশু ধীরে ধীরে বুঝিতে পারে। আদিম মানুষ কত যুগ লক্ষ করার ফলে এই অতি সহজ সত্য জানিতে পারিয়াছে তাহা কল্পনা করা যাইতে পারে। আমরা যাহা বহুদিনের যত্নে ও চেষ্টায় জানিয়াছি আমাদের সন্তানগণ তাহা অতি সহজে অল্প দিনে জানিতে পারিতেছে। কিন্তু প্রথম কোনও বিষয় জানিতে পারা অতি কঠিন চেষ্টাসাধ্য। কার্যকারণসম্বন্ধ বিষয়ে জ্ঞান লাভও আমাদের পক্ষে তেমনই কঠিন। আজ যে বীজ পড়িল কয়েক মাস পরে তাহা হইতে চারা গজাইয়া তাহাই আবার বৃক্ষে পরিণত হইয়া ফল দিবে এবং সেই ফল হইতে আবার বীজ পাওয়া যাইবে আজিকার দিনের এই অতি সহজ জ্ঞান লাভ করিতে প্রথম মানুষের কত যুগ যে কাটিয়া গিয়াছে কে জানে। এই নিয়মেই আমি আজ যাহা করি তাহার ফল বহু বৎসর পরে ফলিতে পারে এই বোধ মনে জাগে। আমাদের মন ক্রমে বর্তমান অতিক্রম করিয়া ভবিষ্যতের দিকে ডানা মেলে; আজ যে-ইচ্ছা মিটিল না ভবিষ্যতে একদিন হয়তো মিটিবে এই আশা করে। অনেক আশা এই নিয়মে পূরণ হয় ইহাও আমরা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে পাই। আবার অন্যদিকে দিন আর রাত যেমন ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসে আমাদের জাগরণ ও নিদ্রাও তেমনই ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসে। ঘুম হইতে জাগি, আবার ঘুমাই আবার জাগি, এই তো আমাদের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা। ইহার মধ্যে কম ঘুম বেশী ঘুম আছে কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা আবার জাগি এইটাই মনে থাকে। সে ভরসা না থাকিলে হয়তো আমরা ঘুমাইতেই পারিতাম না। মানসিক রোগীর চিকিৎসা করিবার সময় দেখিয়াছি, যে-রোগী বিশ্বাস করে ঘুমাইলে আর সে জাগিতে পারিবে না তাহাকে অতি মাত্রায় অবসাদক ঔষধ দিয়াও সহজে ঘুম পাড়ানো যায় না। ঘুমের মধ্যে কিছু অঘটন বা ক্ষতিকর অবাঞ্ছিত কিছু ঘটিবে মনে করিলে ঘুমাইতে পারা যায় না।

আমাদের এই প্রকার বহু অভিজ্ঞতা হইতে মনের এমন এক ধারা গড়িয়া উঠে যাহার ফলে আমরা মৃত্যুকেও সমাপ্তি বলিয়া মনে করি না; মৃত্যুর পরেও এক বিশেষ রকমের জীবনের কল্পনা করি এবং জন্মান্তরবাদের সূচনা করি। সুতরাং মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমি বা আমার কিছু যে আর থাকে না অর্থাৎ আমার চেতনা সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া যায় আমি এরূপ মনে করি না। ঘুমের মতই মরণের পরে আবার জাগরণ আসিবে মনে করি; কেবল তাহাই নহে, অতি দৃঢ়ভাবে এ কথা বিশ্বাস করি। মরিয়াও আমার চেতনাকে আমি বাঁচাইয়া রাখি। দেহ না থাকিলেও দেহীর আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ অনুভব করিবার ক্ষমতা আমার থাকিয়া যায় মনে করি; এক কথায় মরিয়াও আমি মরি না। এ যেন কাল্পনিক এক ভিন্ন জগতে বাস আরম্ভ হয় মনে করি। তাই আত্মীয়স্বজন ভালবাসার পাত্রপাত্রী ও বাস্তব সব কিছুই ছাড়িয়া যাইব মনে করিতে কষ্ট বোধ করি। মৃত্যুকে যদি সমাপ্তি বলিয়া মনে করি তবে এ দুঃখের কল্পনাও অবান্তর। ছাড়িয়া-যাওয়ার অনুভূতি জীবিতের; কিন্তু যেখানে জীবনই নাই সেখানেও সেই অনুভূতিকে বাঁচাইয়া রাখা মনের পূর্বোল্লিখিত ভ্রান্তি হইতে আসে। একবার মনের এই ভঙ্গি গড়িয়া উঠিলে পরে ক্রমে এই জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে কর্ম ও কর্মফলও জীবনের সীমা পার করিয়া কল্পিত পরজীবনে ছড়াইয়া যায়। তখন এ জীবনের কর্মের ফল পরজীবনে ভোগ করিবার কল্পনা অতি সহজেই আসিয়া

স্থান করিয়া লয়। বাস্তব জীবন তখন বহুলাংশে কল্পনার সঙ্গে মিশিয়া এক নূতন জগৎ ও জীবনের স্বপ্ন গড়িয়া তুলে। এ জীবনে দৈনন্দিন নানান কাজে কর্মে যেমন নিয়ম মানিয়া চলিতে হয় এবং সেই আমাদেরই সৃষ্ট নিয়ম লঙ্ঘন করিলে শাস্তি ভোগ করিতে হয়, ঠিক একই মানসিকতার মৃত্যুপর-জীবনে প্রসারণের ফলে স্বর্গ ও নরকের সৃষ্টি হইয়াছে। সৎ কাজ করিলে পুণ্য হয়, পুরস্কার পাওয়া যায়, আর অসৎ বা অন্যায় কাজ করিলে পাপ হয়, শাস্তি ভোগ করিতে হয়, প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় ইত্যাদি ধারণা চারিদিকে ভিড় করিয়া আসে।

সংক্ষেপে এইটুকু বলিয়া আবার পুরানো কথায় ফিরিয়া যাওয়া যাক। মৃত্যুর ভয় সম্বন্ধে যে তিনটি মূল কারণ উল্লেখ করিয়াছি এখন সেগুলিকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে মনের এই ভয়ের কারণ বুঝিতে সুবিধা হইবে। আমরা ভয় পাই কখন? এক কথায় বলা যায় যে-অবস্থা আমি অপ্রীতিকর, কষ্টকর, অনিষ্টকর ইত্যাদি মনে করি সেই রকম কোনও অবস্থা ঘটিবার সম্ভাবনা মনে জাগিলেই ভয় হয়। যে-অবস্থা সুখের মনে করি তাহা অজানা অচেনা হইলেও উৎকণ্ঠা বা ভয় হয় না। মৃত্যুর পরে আমার এ জীবনের চেয়ে অধিক দুঃখকষ্ট ভোগ করিতে হইবে এই কল্পনা মনে থাকিলেই মৃত্যুকে ভয় করিব। আরও একটা দিক্ ভাল করিয়া বুঝিবার দরকার আছে। যাহা ঘটে তাহা অতিমাত্রায় কষ্টকর হইলেও ঘটিবার পরে সে-সম্বন্ধে আমার আর ভয় থাকে না—তাহার জন্য কষ্ট যাহা হয় তাহা বাস্তব হইয়া তখন ভোগ করি এবং কষ্ট দূর করিবার জন্য প্রতিকারের চেষ্টা করি। এক্ষেত্রে ভয়ের কোনও লক্ষণ দেখা দেয় না। যাহা ঘটিল তাহার ফলে আমার আরও কি কষ্ট আসিবে সেজন্য ভয় হইতে থাকে। অর্থাৎ ভয় সকল অবস্থাতেই বর্তমানের সীমা অতিক্রম করিয়া ভবিষ্যতের সম্ভাবনার সম্বন্ধে অস্পষ্ট কাল্পনিক দুঃখের সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। তাহা না হইলে ভয় হইতে পারে না। বাস্তবকে সহজ খোলা চোখে দেখিলে এবং তাহা মানিয়া লইতে পারিলে ভয় হইতে পারে না। যন্ত্রণায় ছটফট করিতে পারি। কাতর হইয়া সাহায্যের জন্য আকুলি বিকুলি করিতে পারি, কিন্তু ভয় হইবে না। ঠিক কি রকম যন্ত্রণা বা কষ্ট হইবে এবং তাহার কি পরিণাম হইবে তাহা স্পষ্ট করিয়া মনে মনে বুঝিয়া অনুভব করিয়া লইতে পারিলে সে অবস্থার জন্য ভয় আর থাকে না। অজানাকে আমরা ভয় করি না। আসল ভয় অনির্দিষ্ট দুঃখ-যন্ত্রণার, বা ক্ষতি ইত্যাদির সম্ভাবনার জন্য। অজানাকে যখন ঐ সব সম্ভাবনাপূর্ণ মনে করি তখনই ভয় হইতে পারে, তাহা না হইলে ভয় হয় না। অজানা অবস্থাকে যদি সুখকর বা আনন্দদায়ক মনে হয় তবে সে অজানা আর ভয়ের উদ্রেক করে না; তাহা তখন কাম্য হয়। যে-রোগী দীর্ঘকাল রোগযন্ত্রণা ভোগ করে এবং আরোগ্য লাভের কোনই সম্ভাবনা নাই নিশ্চিত জানে সে যন্ত্রণা সহিতে না পারিলে সত্যই মৃত্যু কামনা করে। তখন সে বর্তমান অবস্থার তুলনায় মৃত্যুকে আর ভয় করে না। যন্ত্রণা দূর করাই তখন প্রধান চিন্তা হয়। অজানা দেশে যাইতে এই জন্যই লোকে ভয় পায়। মৃত্যুর পরপারের কাল্পনিক রাজ্যেও এই অনির্দিষ্ট কষ্টকর সম্ভাবনাকেই আমরা ভয় পাই। মনে এ ভয় সৃষ্ট হয় কেন? আমাদের মনের আবেগ অনেক পরিমাণে বৈশব-কাল-ধর্মী থাকিয়া যায়। সেই আবেগ, আমাদের বয়স বাড়িলেও, শিশুর আবেগের মতই অস্পষ্ট অনির্দিষ্ট থাকিয়া সমস্ত অবস্থাটাকে ধোঁয়াটে করিয়া তুলে। যাহার মনে এই রকম অপরিণত আবেগ যত বেশী থাকে তাহার দৈনন্দিন জীবনে ভয় তত বেশী হওয়ার সম্ভাবনা এবং মৃত্যুভয়ও তাহার বেশী হইবে।

মনের স্বাভাবিকধর্ম জীবনকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠে। অর্থাৎ মন জীবনধর্মী এবং জীবনের সঙ্গে একান্ত ভাবে যুক্ত। জীবন-বিরহিত বা জীবন-বিচ্ছিন্ন মনের কল্পনা করা চলে না। এই মন দিয়া আমরা

মৃত্যুকে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারি না; ইহা সম্ভব নহে। যখনই কিছু চিন্তা বা কল্পনা করি তাহা জীবিত অবস্থায়ই করি, মন দিয়া তাহা অনুভব করি। মৃত্যুকে তাই জীবিত মন দিয়া অনুভব করা সম্ভব নহে। জীবনের পার হইতে নিদ্রা, ক্ষণিক মূর্ছা ইত্যাদি অনুভূতি হইতে মৃত্যুর আভাস আমরা কল্পনা করি। যে-দূর ইঙ্গিত আমরা অনুভব করি তাহাও জীবনের সীমানার মধ্যে থাকিয়াই করি; তাহাও জীবিতের মৃত্যু-সম্বন্ধে কল্পনা মাত্র—তাহা প্রকৃত মৃত্যু নহে। মৃত্যুর অভিজ্ঞতা কিছু নাই। মৃত্যু মৃত্যুই; মৃত্যুতে মনের অবসান ঘটে, সুতরাং চিন্তা, কল্পনা, অনুভূতি মনের যাহা কিছু ক্রিয়া কিছুই থাকে না। জীবন থাকিতে মানুষ মৃত্যুকে ঠিকমতো বুঝিতে পারে না। আবার মৃত্যু হইলে তাহা বুঝিবার মতো আমার মন বলিয়া কিছু আর থাকে না।

মানুষ আপন কল্পনার রঙে স্বর্গ-নরকের বিচিত্র বর্ণনা দিয়াছে। ছেলে বেলায় একটা পটে আঁকা নরকের ছবি দেখিয়াছিলাম। এক এক পাপের জন্য এক এক রকম শাস্তির ছবি তাহাতে আঁকা ছিল। কোনটাতে ভীষণাকার মহিষ, ঘোড়া, শূকর ইত্যাদির মাথাযুক্ত যমদূতেরা করাত দিয়া পাপীর মাথা হইতে দেহ চিরিয়া দেখিতেছে, কোনটাতে সাঁড়াশি দিয়া জিভ টানিয়া বাহির করা হইতেছে, আবার কোথাও বা জলন্ত আগুনে পুড়াইয়া মারা হইতেছে বা বিরাট্ কড়াইয়ের ফুটন্ত তেলের মধ্যে পাপিষ্ঠকে ফেলিয়া দেওয়া হইতেছে ইত্যাদি বীভৎস ভয়ঙ্কর সব চিত্র আঁকা। গোলকধাম খেলাতেও নরকে পতনের ভয়ের কথা আজও মনে আছে। এই প্রকার কল্পনা ছেলেবেলা হইতে মনে ভয় সঞ্চার করিতে সাহায্য করে। অপরদিকে জ্ঞানীরা অতি সহজ দৃষ্টিতে দেখিয়া একটু কল্পনা যুক্ত করিয়া বলিয়াছেন জীর্ণ বস্ত্র যেমন আমরা ত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র গ্রহণ করি তেমনই মৃত্যুতে আমরা জীর্ণ দেহ ত্যাগ করিয়া নবকলেবর গ্রহণ করি। এই উক্তির মধ্যে যে জন্মান্তরে বিশ্বাস প্রকাশ পাইতেছে সেকথা বলাই বাহুল্য। মৃত্যুপারের জীবন সম্বন্ধে নানান দেশের নানান জাতির মধ্যে নানারকমের বিশ্বাস দেখা যায়। সে-আলোচনা এখানে করিব না।

মৃত্যুভয় কমবেশী প্রায় সকল মানুষের মধ্যেই দেখা যায়। এই-ভয়-শূন্য মানুষ নাই বা থাকিতে পারে না, এমন কথা বলিতেছি না। এমন লোক আছে যাদের এই ভয় বিশেষ মাত্রায় নাই; এবং এমনও উদাহরণ পাওয়া যায় যেখানে বিশেষ অবস্থায় মৃত্যুভয় একেবারেই থাকে না। যুদ্ধেলিপ্ত সৈনিকদের মৃত্যুভয় অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়। মানুষ যদি কোনও মহৎ ব্রত গ্রহণ করিয়া কাজে নামে সে-কাজে মৃত্যুকে সে ভয় পায় না—বাংলার অগ্নিযুগের বীরসন্তানদের কাহিনী আজও উজ্জ্বল হইয়া আছে। ক্ষুদিরামের কথা বাংলা ভুলে নাই। দ্বিতীয়-মহাযুদ্ধে-যোগদানকারী একজন যবদ্বীপবাসীর চিকিৎসার সময় জানিতে পারিয়াছি জাপানীর হাতে মালয় উপদ্বীপে বন্দী অবস্থায় অন্য আরও কয়েকজনের সঙ্গে তাহারও ফাঁসির হুকুমের পর একক ঘরে বন্দী রাখা হয়। প্রত্যহ ভোরে দুইজন করিয়া বন্দীর ফাঁসি দেওয়া হইত অপর বন্দীদের চোখের সামনে। যে-ভোরে আমার রোগীর ফাঁসি হইবার কথা তাহার আগের শেষ রাত্রে জাপান আত্মসমর্পণ করায় যুদ্ধ থামিয়া যায় এবং উক্ত যবদ্বীপবাসী সৈনিকের ফাঁসি আর হয় নাই। ঐ সময়কার মনের অবস্থার যে-বিবরণ তাহার নিকট হইতে পাইয়াছি তাহা হইতে বলিতে পারি যে, তাহার মনে পরের দিকে আর কোনও ভয়ই ছিল না। অবধারিত সত্য হিসাবেই সে মৃত্যুকে মানিয়া লইয়াছিল। একজন ডাচ্ রোগীর জীবনেও গত মহাযুদ্ধের সময় প্রশান্ত মহাসাগরে অন্ধকার রাত্রে নিজের জাহাজ শত্রুহাতে পড়ার ভয়ে তাহা ডুবাইয়া দেওয়ার কাহিনী শুনিয়াছি। সে আশ্চর্যরকমে কোনও মতে

প্রাণে বাঁচিয়াছে। সে-বিপদের মধ্যে মৃত্যু সুনিশ্চিত জানিয়াও তাহার ভয় ছিল না। কিন্তু যতটুকু বুঝিয়াছি উক্ত উভয়ক্ষেত্রেই মন তখন স্তব্ধ হইয়া বোবা হইয়া গিয়াছিল। এ অবস্থাকে সত্যবোধের সমার্থক মনে করিতে পারা যায় না। তবু ইহাতে বাস্তব নিশ্চিত সত্যকে স্বীকার করা হইয়াছে। ইহা কম শক্তির পরিচায়ক নয়। আমাদের দেশের সতীদাহ, জহরব্রত, জাপানের হারাকিরি, আত্মহত্যা ইত্যাদি বহু উদাহরণ বিশেষ অবস্থায় মানুষের স্বেচ্ছায় নির্ভয়ে মৃত্যুবরণ প্রমাণিত করে।

অপরদিকে কবি ও সাহিত্যিকের কল্পনায় মৃত্যুকে নানাভাবে রসসিক্ত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। এমন কি মৃত্যুকে "শ্বাস সমান"ও বলা হইয়াছে। ভয় আছে বলিয়াই বারে বারে সে-ভয়কে অস্বীকার করিবার চেষ্টা দেখা দিয়াছে; এমন কি মৃত্যুকে আর ভয় করি না বলিয়া জোর গলায় জাহির করিতে বিশ্ব-কবির কাব্যে শুনিয়াছি। এ সমস্তই পূর্বোক্ত আমাদের কল্পনার জগৎ জীবনাতীত জীবনের কথার সাক্ষ্য। দুঃসহকে সুসহ এবং অসহনীয়কে সহনীয় করিয়া তুলিবার প্রয়াস মাত্র। ইহার উপকারিতা বা আমাদের মনকে মায়াজালে ভুলাইবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কোনও প্রশ্নই উঠে না। ইহা সাধারণ মানুষের জীবনে অনিবার্য দুঃখের চাপ হইতে ক্ষণিকের জন্য মনকে মুক্ত করিয়া রসমাধুর্যে ভরিয়া দিতে সাহায্য করে। এই রসলিপ্ততা মনের এক স্বভাবের দিক হইতে যেমন সত্য, অপরদিকে নিরেট বাস্তব মৃত্যুর সম্মুখে তেমনই মিথ্যা।

মৃত্যুভয়ের কারণ সম্বন্ধেও অনেক মত আছে। পূর্বজন্মের মৃত্যুযন্ত্রণা আমাদের জীবাত্মার জানা আছে বলিয়াই আবার মৃত্যু সম্ভাবনায় আমরা ভীত হই, এমন কথাও মানুষ বিশ্বাস করিয়াছে। বিশ্বাসের রকমের অন্ত নাই। মনে রাখিতে হইবে এই সব বিশ্বাসও আমাদের মনের ক্রিয়াতেই গড়িয়া উঠে।

মানসিক রোগীদের চিকিৎসার সময় এবং সুস্থমনা শিক্ষার্থীদের মনঃসমীক্ষণ করিয়া এই মৃত্যুভয়ের যে-সূত্র পাইয়াছি সে-সম্বন্ধে সামান্য কিছু উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। সংক্ষেপে যে-সকল কথার আলোচনা করিয়াছি তাহা হইতে দেখা গিয়াছে যে, ভয়ের মূল আমাদের ভবিষ্যতের সম্বন্ধে অস্পষ্ট অতিমাত্রায় কিছু অনিষ্ট বা যন্ত্রণার সম্ভাবনার কল্পনার মধ্যেই রহিয়াছে। বলিয়াছি যে-দুঃখ অনিবার্য তাহাকে শিশু প্রকৃতির আবেগের প্রভাবে ঘোলাটে করিয়া না তুলিয়া যদি আমরা প্রকৃত অবস্থাটি মনে স্বীকার করিয়া লইতে পারি তাহা হইলে কোনও অবস্থাতেই আর মানুষ ভয় পাইবে না। সে তখন হয় যন্ত্রণা বা মানসিক কষ্ট সহ্য করিতে চেষ্টা করিবে, না হয় তাহার প্রতিকার কিসে হইতে পারে তাহাই সন্ধান করিবে। দুঃখ-যন্ত্রণা-সম্ভব ক্ষেত্র সে এড়াইয়া যাইতে চেষ্টা করিবে না এমন নহে; দুঃখ কেহই চাহে না—যদি না সে-দুঃখ বরণের অন্তরালে কোনও মাহাত্ম্যবোধ বা প্রায়শ্চিত্তবোধ থাকে। উদাহরণ স্বরূপ, ধর্মপালন করিতে যাইয়া কঠোর নিয়ম পালন করিয়া কৃচ্ছ্রসাধন করা, নানাপ্রকারের প্রায়শ্চিত্ত করা ইত্যাদি বহু আচরণের উল্লেখ করা যায়। এক শ্রেণীর মানসিক রোগী নিজেকে সর্বদাই পাপী বা দোষী মনে করিয়া নানারকমের আত্মপীড়নের প্রণালী রচনা করিয়া লয়। মনে রাখিতে হইবে প্রিয়জনের জন্য যে আপাত-দৃষ্টিতে দুঃখকর কাজ আমরা স্বীকার করি তাহাতে সুখ আছে। এ কথাও মনে রাখিতে হইবে দুঃখকে চাহি না বলিয়াই যে, দুঃখের সম্ভাবনা দেখা দিলে আমরা ভীত হই তাহা সত্য নহে।' দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা ইহাদের মধ্যে ভয়ের কিছু নাই। আবারও বলি ভয় আমাদের অপরিণত শিশুসুলভ প্রক্ষোভজ অস্পষ্টতা ও তাহার আত্যন্তিকতা হইতে উৎপন্ন হয়। মনের এই অপরিণত প্রক্ষোভজ অবস্থা হইতে আমাদের ভালবাসারও উৎপত্তি হয় এ কথা বলিলে যে প্রবল প্রতিবাদ আন্দোলিত হইবে তাহা জানি, তথাপি বহু

মানুষের মনঃসমীক্ষণের অভিজ্ঞতা হইতে এই তথ্যই পাইয়াছি। আমাদের ভালবাসা, ভয় প্রভৃতি মনের প্রাথমিক প্রক্ষোভজ অবস্থার ভিন্ন দিকের প্রকাশ মাত্র। এ সম্বন্ধেও বিস্তৃত আলোচনা এখানে করিবার প্রয়োজন নাই। শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার সময়ে তাহার মাতৃগর্ভবাসের অভিজ্ঞতা হইতে বহির্জগতের বিপুল এবং প্রবল পরিবর্তনের মধ্যে প্রথম প্রবেশ করিয়া যে-অনির্দিষ্ট অপ্রীতিকর অনুভূতি লাভ করে তাহা সুস্পষ্টভাবে বুঝিবার ক্ষমতা তাহার থাকে না। তাহার অপুষ্ট মন সম্পূর্ণ অবস্থাটাকে সুস্থভাবে গ্রহণ করিতে না পারিলে এবং মাতৃদেহ-ত্যাগের অনুভূতি সহজভাবে না নিতে পারার ফলে যদি তীব্র মানসিক ভাব-প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তবেই তাহার ভয়ের সূচনা হয়। এই ভয় পরে বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি বাস্তববোধের দ্বারা মার্জিত ও সংশোধিত না হয় তবে ভবিষ্যত জীবনেও ভয় থাকিয়া যায়।

শিশু মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায় বাহিরের জগতের প্রবল শব্দ, গর্ভধারিণীর প্রবল গতিতে যানবাহনে চলা, ধাক্কা বা ঝাঁকুনি লাগা, উত্তাপের বিশেষ ব্যতিক্রম, এবং মানসিক উদ্বেগ অশান্তি ভয় ক্রোধ ইত্যাদির জন্য বা রোগ ইত্যাদির জন্য দেহের রাসায়নিক বা বীজাণুর আক্রমণের ফলে গর্ভজাত সন্তানের মানসিক কী পরিবর্তন কতখানি হয়, বা তাহার ফলে গর্ভে থাকা অবস্থাতেই ভ্রূণের মনে ভয় হয় কিনা, হইলেও তাহা কি রকম বা কতখানি প্রবল হয় এ সম্বন্ধে কিছুই জানা সম্ভব হয় নাই। এই সকল কারণে যদি শিশু ভয় পাইয়াই থাকে তবে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে শিশুর জীবনে সে ভয় কী ভাবে প্রভাববিস্তার করে তাহা সঠিক করিয়া কিছু বলা সম্ভব নহে। কেবল অনুমান করা যাইতে পারে যে, জন্মের সময় শিশু হঠাৎ যে-গভীর ও বিস্তৃত পরিবর্তনের সম্মুখীন হয় পূর্বের অনুভূতির অস্পষ্ট অস্থস্তিকর স্মৃতির ফলে হয়তো তখন প্রবলতর মানসিক আবেগের সৃষ্টি হইতে পারে। ইহা অনুমান মাত্র। এ সম্বন্ধে কোনও প্রমাণ আজও পাওয়া সম্ভব হয় নাই। স্বভাবের কতটা বংশগতির (heredity) ধারানুসারে চলে আর কতটা শিশুর গর্ভাবস্থায় বিভিন্ন অনুভূতির প্রতিক্রিয়ার ফলে হয় তাহাও বলা সম্ভব নহে। এ সকল বিষয়ে এখনও অনেক তথ্য এবং তত্ত্ব জানিবার আছে। ভবিষ্যতের মনোবিৎ পূর্ণতর জ্ঞান লাভ করিবেন। যতটুকু জানা গিয়াছে তাহা হইতে বলা যাইতে পারে যে জন্মের প্রথমেই বাস্তবের সংঘাতে এই যে-ভয় মনে জাগে, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বস্তুজগতের সঙ্গে শিশুর পরিচয় ঘটায় যে-জ্ঞান সে লাভ করিতে থাকে তাহা দ্বারা এই প্রাথমিক ভয়কে যদি ধীরে ধীরে জয় করিতে না পারে তবে দৈনন্দিন জীবনে, বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হইতে গেলে পরবর্তী জীবনে মন ভয়ে কাতর হয়। সুতরাং শিশুকে জন্মক্ষণের দুঃখ যন্ত্রণা ও মানসিক আবেগ হইতে যত রক্ষা করা যায় ততই মঙ্গল। কেবল তাহাই নহে, নূতন পৃথিবীতে অসংখ্য নূতন পরিস্থিতির সঙ্গে শিশু যথাসম্ভব সহজে সম্মুখীন যাহাতে হইতে পারে সেদিকে সযত্ন দৃষ্টি রাখা খুব দরকার। যাহাতে জন্মক্ষণ বা তাহার অব্যবহিত পরক্ষণ হইতে বেশ কিছুকাল শিশুর কোনও আবেগ অতিমাত্রায় উত্তেজিত না হয় পিতা মাতার সেদিকেও বিশেষ লক্ষ রাখা একান্ত প্রয়োজন। আবেগের উত্তেজনা শিশু কর্ম বা চিন্তায় প্রবাহিত করিতে পারে না এবং ইহাতে যে পুঞ্জীভূত উত্তেজনা মনে অস্থস্তিকর পরিবেশের সৃষ্টি করে সেই অবস্থার সঙ্গে জন্মের সেই প্রাথমিক অভিজ্ঞতা অতি সহজে যুক্ত হইয়া অস্পষ্ট ভয়ের উদ্রেক করে। ভবিষ্যত জীবনেও কোনও কঠিন সমস্যা বা পরিস্থিতি দেখা দিলে মন আবার অতিক্রান্ত সেই প্রাথমিক অবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয় এবং ভয় দেখা দেয়। এইরূপ ভয়-কাতর পুরুষ এবং স্ত্রীলোক উভয় শ্রেণীর মানসিক রোগীদের মনঃসমীক্ষা করিলে দেখা যায় তাহাদের উপস্থচ্ছেদ গুটিয়া (castration complex) দূর করিতে পারিলে রোগীর ভয় অনেকখানি কমিয়া যায়। আপাতদৃষ্টিতে নারীর মনে এই গুটিয়া থাকা অসম্ভব মনে

হইলেও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। নির্জ্জন মনে এই উপস্থচ্ছেদ গুঢ়েষা অবদমিত থাকিয়া কী ভাবে চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে সে আলোচনা এখানে করিব না। কিন্তু এই গুঢ়েষার সঙ্গে অবদমিত নিষ্ক্রিয়তার (passivity) যোগ থাকে। আমাদের মানসিক উভয়লৈঙ্গিক বৃত্তির মধ্যে অবদমিত নারীত্বের ইচ্ছার ভিত্তির উপর উপস্থচ্ছেদ গুঢ়েষা দানা বাঁধিতে পারে। উপস্থচ্ছেদ ভীতির সহিত মাতৃদেহ হইতে বাহিরে আসার অভিজ্ঞতা আবার যোগ হইয়া ভয় বাড়াইয়া তুলে। বস্তুতঃ জীবনের সকল রকমের ক্ষয় ক্ষতিই এই শ্রেণীর লোকের ঐ একই প্রাথমিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে জড়াইয়া যায় এবং ভয় দেখা দেয়।

পূর্বে বলিয়াছি বিশেষ অবস্থায়, বিশেষ কোনও আবেগ দ্বারা সাময়িকভাবে ভয় চাপা দিয়া অসীম সাহসিকতার পরিচয় দেওয়া সম্ভব হইতে পারে। তাহা হইলেও ইহা ভয়শূন্য অবস্থা নহে, ভয়কে চাপা-দেওয়া অবস্থা। সেদিন শিলচরে যাঁহারা বন্দুকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রাণ দিতেও দ্বিধা করিলেন না তাঁহাদের মনে ভয় নাই এমন কথা বলা যায় না। তখন ঐ অবস্থায় তাঁহারা মৃত্যুভয়কে অন্য সংকল্প ও আবেগ দ্বারা জয় করিয়া দেশের পূজ্য হইয়াছেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে এইরূপ নির্ভীক প্রাণ-বিসর্জনের উদাহরণ অনেক আছে! কাব্যে সাহিত্যেও এই জাতীয় বহু চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। প্রকৃত সাধক ও জ্ঞানী নিজ সাধনায় বাস্তবকে সত্যরূপে দেখিয়া মোহমুক্ত হইয়া ভয়হীন হইতে পারেন ইহা কল্পনা মাত্র নহে। জীবনের সাধনায় মানুষ এই ভয়হীন মানসিক অবস্থা লাভ করিতে পারে। সে সাধনার পথ যাহাই হউক তাহার মূল সত্য মনঃসমীক্ষায় লব্ধ মনের মূল সত্য হইতে অভিন্ন বলিয়া মনে হয়।

মাখনের কথা

উদয়চাঁদ পাঠক

[এই বিভাগে নানান চেনা অচেনা চরিত্রের কোনও বিশেষ দিকের একটি রেখাচিত্র আঁকতে চেষ্টা করব। কোনও বিশেষ ব্যক্তিকে লক্ষ্য ক'রে চরিত্র রচনা করা হয় নি। নায়ক নায়িকার নামও কাল্পনিক ; কেবল চরিত্রটাই সত্য।]

সেদিন পঞ্জিকার হিসেবে বসন্তকাল ; কিন্তু নিজের অভিজ্ঞতায় তা স্বীকার করতে পারি নি। বসন্তের কাব্য-জাগানো দখিন হাওয়ার কোনও চিহ্নই ছিল না। পৌষের হাড়-কাঁপানো শীত। তবু সারাদিনের সাত-মিশেলি ঝামেলা সেরে, রাতের আহার শেষ ক'রে, সামনের ফালি বারান্দায় গরম কাপড় মুড়ি দিয়ে বসেছি, একটু আরাম করবার আশায়। সামনের জনবিরল রাস্তায় শহরের দঙ্গল-করা বাড়িগুলোর কেমন ফাঁক দিয়ে একটু চাঁদের আলো এসে পড়েছে। চুপচাপ ব'সে আছি। কখন জানি না শহর ছেড়ে অতীতে-ফেলে-আসা গ্রামের মাঠ গাছ ছোটখাটো বাড়ি আড়াল করা বাঁশ ঝাড়ের উপর লুটিয়ে-পড়া মায়াজড়ানো চাঁদের আলোর স্বপ্নলোকে মন ডুব দিয়েছে। কবি নই, সামান্য কিছু কবিতা পড়েছি মাত্র। অনেকে যেমন এক বয়সে একটু কবি হতে চায়, গলায় সুর টানে, এমন কি দু চার লাইন অক্ষরের মিল ক'রে কবিতা লিখতেও চেষ্টা করে, আমিও তার বেশী কিছু করি নি। তবু মনে দেখি একটু গানের আমেজ দেখা দিচ্ছে। চোখের দৃষ্টি বোধহয় একটু আয়ত হয়ে এসেছিল। সব মিলে অকালবোধনের মতই অকালে কবিতায়-পাওয়া গোছের অবস্থার উপক্রম হয়ে আসছিল। কিন্তু ভাগ্যে তা সইল না। হঠাৎ একজন এসে ব'লে উঠল—"এই যে, ডাক্তারবাবু, চাঁদের আলো পোয়াচ্ছেন বুঝি! বেশ বেশ, ভাগ্যবান লোক! দিনে শীতের সূর্যের রোদ আর রাতে চাঁদের রোদ ভোগ ক'রে নিচ্ছেন!" এই অপ্রত্যাশিত ঝাঁকুনিতে অতীতের সব নেশা ছুটে গেল। এ আবার কি হ'ল? আমি ডাক্তার হলাম কবে? ছেলেবেলায় কুইনীন আর টিংচার আইওডিনের ডাক্তারি বাল্যবন্ধুদের মধ্যে প্রচুর প্র্যাকটিস্ করেছি কিন্তু তারপর কোনও দিন তো মেডিকেল কলেজের দুয়ারে পা দিই নি। তবু ডাক্তার! বারান্দায় বাতি ছিল না, দূরে রাস্তার আলো গাছের আড়ালে বাধা পড়েছে। ঠিক চিনতে না পেরে পরিচয় জিজ্ঞাসা করব মনে ক'রে কিছু বলবার আগেই, আগন্তুক সময় না দিয়ে ব'লে চলল—"চিনতে পারেন নি বুঝি? আমি আপনার আত্মীয় ; সে অনেক দিন দেখা কিনা তাই অন্ধকারে ভুল তো হতেই পারে। মাখন, মাখন কে চেনেন না! আমি এখন বড় হয়ে গেছি।" কে মাখন? ও নামের আত্মীয় কেউ আছে ব'লে আমার মনেই হ'ল না। কলকাতার শহর, সুযোগ পেয়ে কিছু আদায় করবার মতলব কিনা তাই বা কে জানে। বললাম, "তোমাকে তো চিনতে পারছি না। মাখন নামে আমার কে আত্মীয় আছে আমার মনে পড়ছে না।" বেশ প্রাণখোলা হাসি হেসে বললে, "তা নাই-ই চিনলেন, বসুন বসুন আপনি, আমি যাই। এমন চাঁদের আলো, কিন্তু মরতে আমার আদৌ ইচ্ছে নেই। আচ্ছা যাই।" কথা শেষ করেই আবার সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ব'লে উঠল "ওই যা, আপনাকে যা বলতে এসেছিলাম তা তো বলাই হয় নি। দেখুন কাণ্ডটা ; বসন্ত ঋতুতে মানুষের এ রকমটা হয়। জ্যোৎস্নার আলো, ঝিরঝিরে বাতাস, অভিসারে বেরুতে ইচ্ছা করে না আপনার?" আমার কথার অপেক্ষা না রেখেই একটা চেয়ার টেনে ব'সে প'ড়ে শ্রীমান মাখন ব'লে যেতে

লাগল—"এমন রাত কত কেটেছে, তখন মিনতিও ছিল। আপনি তাকে দেখেন নি। অদ্ভুত মেয়ে, ডাক্তারবাবু, তাকে না চিনলে বুঝতেই পারবেন না। তাকে সেই পেয়েছিলাম, কিন্তু ধরা দিল না। না, না, তা সত্যি নয়। আমি তো তাকে চাই নি, সে আমাকে চেয়ে চেয়ে হারিয়ে গেছে। আমাকে পাবে কেন? পাবে কোথায়? সুকুমার রায়কে কাঙ্কেশ্বরের হদিস কে দিয়েছিল জানেন?" স্বর নীচু ক'রে বললে "এই আমি। কাউকে বলবেন না যেন—ওর কিছু ছিল না। নামের জন্য আমার কাছে অনেক সাধ্য-সাধনা করেছিল তাই বলেছিলাম হদিস্‌টা। ব্যাস্, ছাপার অক্ষরে নিয়ে দিলে ছাপিয়ে বই। আর যাবে কোথায়; হু হু করে বই বিক্রি হ'ল, তার নাম ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু সে নিমকহারামি করেছে। তারপর থেকে আমার সঙ্গে আর দেখা করে না, কেবল অন্য লোক পাঠিয়ে আরও সব কাহিনী জেনে নিয়ে নিজের নামে ছাপিয়েছে। পরে সব খবর আমি পেয়েছি। আচ্ছা দেখে নেব, আমিও কাঁচা ছেলে নই।" ক্রমে যেন একটু উত্তেজিত ভাব দেখা দিতে লাগল। কেমন সন্দেহ হতে লাগল। এই ২৬।২৭ বছরের যুবক, পাতলা লম্বাটে গড়ন, নেশা ক'রে ভুল ক'রে এখানে এল কি? বললাম, "রাত হ'ল বাড়ি যাও, বাড়িতে সবাই ভাবছেন হয়তো।" হঠাৎ আরও উত্তেজিত হয়ে ব'লে উঠল "বাড়ি যাব কেন? ওরা আমার কে? আমি কি জানি না ওরা আমায় গাছতলা থেকে কুড়িয়ে এনেছিল—আমার উজ্জ্বল জ্যোতি দেখে! ভেবেছিল দেবদূত। আমায় লালনপালন ক'রে নিজেদের ছেলে ব'লে চালালে ওদের লাভ হবে। ঘরে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার জমে উঠবে। দেব না ওদের। কিছু দেব না। আপনি নেবেন ডাক্তারবাবু! আপনাকে আমার সব বিদ্যা দিয়ে দেব। কালকে আপনাকে খাতা তিনটে এনে দেব। তিনটে থিওরি ওতে পাবেন যে কোনওটা আপনি ছাপিয়ে দিন। নোবেল প্রাইজ পেয়ে যাবেন। কিন্তু সাবধান থাকবেন, ঐ বিধান রায় পেছু লেগেছে। জগজ্জীবন রামকে লেলিয়ে দিয়েছে লেখাগুলি আমার কাছে থেকে আদায় ক'রে নিতে। শয়তান! ধরতে পেরেছি ওদের চালাকি। বলে কিনা ৫ লক্ষ টাকা দেবে। তাও জানেন ৫০ বার এসে ঘুরে ঘুরে তারপর স্বীকার করেছে। কঞ্জুস, প্রথমে বলেছে ৩০০ টাকা দেবে। পরে বলে আরও কিছু বেশী। এমনি ক'রে দর কসাকসি ক'রে ৫ লাখে উঠেছে। কি জানি কি বদ মতলব আছে। টাকাটা দিয়ে লেখাটা হাতে পেয়েই আবার পেছনে পুলিস লাগাবে। বলবে কোথায় পেলে টাকা। ওরা সব পারে। কলিকাল, ঘোর কলিকাল! আপনি লেখাগুলো নিয়ে নিন। নোবেল প্রাইজ পেয়ে আমাকে তিন হাজার টাকা দেবেন, তাতেই আমার হবে। বেশী টাকার দরকার নেই। আপনি টাকা করলে কেউ পুলিস লাগাতে পারবে না—আপনাকে ওরা চেনে। আচ্ছা আপনি একটা কাজ ক'রে দেবেন? অফিসে আমার মাইনের ১২ টাকা কেটে রেখেছে—বলে, আমি অফিসে যাই নি তাই। আমার যা কাজ তা সব তো আমি করেই এসেছি, তবু কেন মিছামিছি অফিসে যাব—যাব না! দেখি ওরা টাকা দেয় কিনা। মিনতি কত ভাল, জানেন? সে বলেছিল 'লেখাগুলো তোমারই থাক, ছাপিয়ে দিও, নাম হবে—তোমার নাম হওয়াই তো চাই।' তার বাবা মা শয়তান, তাকে জোর ক'রে বিয়ে দিয়ে দিল। আমি জানতেই পারি নি।"

মাখন তখন রুদ্ধ আবেগে কাঁদছে। তাকে কি বলব, কি ক'রে থামাব, সান্ত্বনা দেব কিছুই ভেবে পাচ্ছিলাম না। আকাশের চাঁদ ক্রমে পাশের বাড়ির ছাদের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছে—সামান্য আলো মাখনের গায়ে এসে পড়েছে। দুই হাতে নিজের বুক জড়িয়ে ধ'রে সে ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে লাগল। তার সে দুঃখ কাতরতা আমাকেও একটু নাড়া দিল। ধীর কণ্ঠে তাকে বললাম "মাখন দুঃখ ক'র না। তোমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে। মিনতির বিয়ে হয়েছে তাতে কী! তুমি তাকে ভালবাস তাই-তো

মহামূল্যবান—তাতেই তুমি সুখী হবে।" মাখন যেন শোকে উন্মত্ত হয়ে ব'লে উঠল—"ভালবাসি, তাকে ভালবাসি! এমন ভাল কেউ কাউকে বাসে নি! পরীক্ষা করছে, সে আমায় পরীক্ষা করছে। করুক। আমার বুক চিরে দেখাব—সে আছে, আমার অন্তরে সে আছে, বাইরে না থাকলে কি হবে! চাই না, তাকে আমি চাই না। সে যেখানে খুশি থাক। তাকে চাই না, চাই না, কিছুই চাই না। আমার কিছুই দরকার নেই। তাকে আমি চাই না, চাই না। সে ভিক্ষা নিতে আসবে আমার কাছে। ভালবাসার ভিক্ষা, তাকে দূর ক'রে দেব। তাকাব না তার দিকে, যাক ফিরে, কেঁদে কেঁদে মরুক হতভাগী। আমার উপযুক্ত সে নয়। চেয়ে দেখুক আমার স্থান কোথায়। বিধান রায়, নেহেরু এসে আমায় খোশামোদ ক'রে যায়, পায়না আমার কৃপা। আপনি মহাপুরুষ, ডাক্তার বাবু। আপনার পায়ের ধুলো না নিলে পাপ, মহাপাপ, তাতে আমার অনন্ত নরকবাস হবে।" মাখন আমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম ক'রে যেন তৃপ্ত হ'ল না; বারান্দায় উপুড় হয়ে শুয়ে আমার পায়ের কাছে মাথা এমন ভাবে রাখল যে আমার কোনওদিকে পা সরানোর আর উপায় রইল না। নিজের চেয়ারে পা তুলে বসতে যাচ্ছি—মাখন দু হাতে আমার পা ধ'রে নিজের মাথা ঠুকতে লাগল। ব্যস্ত হয়ে তাকে সামলাতে গিয়ে একবার আমার পা তার মাথায় ঠেকে গেল সে অবিলম্বে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "আর আমার ভাবনা নেই। দেখছেন ডাক্তার বাবু, আজকের রাতটাতে যেন কেমন একটা মোহ জড়িয়ে আছে। কেমন যেন মনে হয় নাকি কে যেন স্নেহের হাত বুলিয়ে দিচ্ছে! কে যেন ভালবাসায় বিভোর হয়ে গায়ে এলিয়ে পড়ছে—তার ছোঁয়া লাগে কিন্তু দেখা যায় না। কেমন মনে হয় নাকি এই আলোর ওপারের গভীর অন্ধকার থেকে কার যেন বেদনাতুর হৃদয়ের আকুল-চাওয়া চারিদিক থেকে এসে ঘিরে ধরছে! ইচ্ছে করে নিজেকে ছেড়ে দিই। স্রোতের টানে চ'লে যাই সেই কি জানি কোনখানে। অন্ধকারে দুই একটা তারা চেয়ে থাকে, দেখে আমায়। যখন তাদের পাশ কাটিয়ে চ'লে যাই, যুগের প্রতীক্ষায় থাকা তাদের সে-আশা ভঙ্গের দীর্ঘশ্বাস শুনতে পাই। আবার চলে তাদের যুগ যুগের সাধনা। কবে আমি আবার সে-পথে আসব ব'লে তারা পথ চেয়ে থাকবে। আবার আশা ক'রে থাকবে সে-যাত্রায় আমি ক্ষণেক দাঁড়িয়ে তাদের দিকে চাইব; তাই থেকে তাদের জন্মজন্মান্তরের সব চাওয়া পূর্ণ হবে। আমি অনন্তকাল ধ'রে অনন্তলোকে এমনি চলেছি। কালান্তরের ধ্বনি দূর থেকে ভেসে আসে। এমন কতবার হ'ল, আরও কতবার হবে—আমি সেই চিরযাত্রী।" এই পর্যন্ত ব'লে মাখনের যেন দম ফুরিয়ে গেল। সে যেন কোনও এক অন্য-লোকে বাস করছে। স্থিরভাবে আকাশের দিকে চেয়ে এমনভাবে ব'সে রইল যে তাকে জাগিয়ে তুলতে ইচ্ছা হ'ল না। অশান্ত শিশু বিক্ষোভের তাড়নায় চঞ্চলবেগে ছুটে এসে যেন ঝিমিয়ে পড়েছে—তবু সে স্থির নয়, মনের দুর্দম আস্ফালন থেমে গেছে—গভীর নিশীথে ভেসে-চলা নৌকার মতো সে যেন কোথায় ভেসে চলেছে। তবু তার এটুকু শান্তি ভঙ্গ করতে ইচ্ছা হ'ল না। তার দিকে তাকিয়ে ব'সে কত কথা মনে হতে লাগল। জীবন, সুখ, দুঃখ, ভালবাসা একের পর এক যেন কথা ব'লে যেতে লাগল। আমরা দুজনেই চুপচাপ ব'সে আছি; কিন্তু মনের ভেসে-চলার বিরাম নেই। এভাবে কতক্ষণ কেটেছে বা আরও কতক্ষণ কাটত জানি না। সে-সহজ ভেসে-চলায় আলোড়ন সৃষ্টি ক'রে অসময়ে তীব্র আলো জেলে একটা মোটর গাড়ি ইলেকট্রিক হর্ণ বাজিয়ে রাস্তা দিয়ে চ'লে গেল। মাখন যেন আবার এ জগতে ফিরে এল; কিন্তু তার গহনলোকের রেশ তখনও কিছু রয়ে গেছে। খুব শান্ত ধীর ভাবে বললে—"ডাক্তারবাবু, আপনি শুতে যান, আমার এখনও অনেক কাজ বাকি। রবিঠাকুর আসবেন তাঁর জন্মশতবার্ষিকীতে তাঁকে কি ভাবে সম্বর্ধনা করা হবে সে-সব কথা

জানতে। তাঁর সঙ্গে সব আলোচনা ক'রে বিশ্বভারতীর কর্তাদের আবার সে-সব জানাতে হবে। নেহেরুকেও জানাতে হবে। শান্তিনিকেতনে আর শান্তি নেই। দেখছেন, কলকাতার কাণ্ডটা। কী যে সব করে! দূর হ সব! যত—চুপ কর, চুপ কর সবে। তুমি কথা ব'ল না। ওঃ ভারি আদর দেখাতে এসেছে! যখন খেতে পারতাম না খাবার দিয়েছিলে? এখন এসেছ সোহাগ দেখাতে। লাগানে বাছুর করতে চায়। হতচ্ছাড়া গোয়ালাগুলোকে ফাঁসি দেওয়া উচিত। করছেন কি আপনারা! বড় বড় ডাক্তার সেজে বসেছেন; যত সব ভড়ং। আর আমার গরীব মাসীমা চিকিৎসা করাতে পারে না, টাকা নেই ব'লে! মেরে ফেলে দেব, কেটে টুকরো টুকরো ক'রে ফেলব বেটাদের। আমি থামব না—না, না, না, কিছুতেই না। যাবই দিল্লী; নেহেরুকে বলবই সব কথা। লাটসাহেব হয়েছে দিল্লীতে ব'সে। গুরুদেবের সেজন্য দুঃখের অন্ত নেই। বলেছি আমি সেখানকার কর্তাদের—যদি কিছু করতে চান তবে গরীবদের গড়বার সুব্যবস্থা করুন। হাজার টাকা খরচ ক'রে বড়লোকের ছেলেরা এসে বাবুয়ানা ক'রে বেড়ায় গুরুদেবের তা সহ্য হয় না। আরও বলেছি…" (মাখনের গলার স্বর আবার একটু তীব্র হতে শুরু করেছে) "উৎসবের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা দিচ্ছে সরকার, সে-টাকা আমাদের। সরকার কে? নেহেরু কে? আমরাই তাকে রেখেছি কাজ চালাতে। টাকা দিচ্ছে গুরুদেবের পুজার জন্যে, সে-টাকা লুটে নেবে কৃপাভোগীর দল! তা হতে দেব না। সব কেড়ে নেব, তাড়াব সব ভণ্ডদের। মিষ্টি কথায় ওরা ফাঁসির হুকুম দেয়। সরষের তেলের দাম বেড়ে গেছে। বাড়ালেই হ'ল? আর আমার মাসীমা গরীব ব'লে খেতে পায় না। আপনারা সব ব'সে ব'সে টাকা লুটছেন। গরীবের কেউ নেই।" বলতে বলতে মাখন অস্থিরভাবে কাঁদতে লাগল, আর সেই সঙ্গে একভাবে ব'লে যেতে লাগল "গুরুদেব তুমি দেখ, তুমি দেখ, তুমি দেখ—দে—গ কী সব করছে, তুমি সব দেখ। শুনছি তোমার নামে টিকিট ছাপা হচ্ছে, সন্দেশ তৈরি হচ্ছে। খাবে কে শুনি? ভাত খেতে পারি না, বুক ফেটে যায়। নেবেই তো চীনে গুণ্ডারা লুটে সব—বেশ করবে।" কান্নার বেগ একটু থামে আবার কথার বেগ বাড়ে। ব'লে চলল—"ছেলেমেয়েদের জীবন গড়বার নামে তাদের সারাজীবনের জন্য দুর্বল ক'রে ছেড়ে দিচ্ছে। নাচ আর গান! যেখানে দরকার—ঘটা দেখানোর দরকার, ডাকো শান্তিনিকেতনের দলকে। তারা দিল্লী আগ্রা ঘুরে নেচে বেড়াবে। গুরুদেবের দোহাই দিয়ে এরা সব পারে। আধমরা ক্ষুদ্রপ্রাণ লোকগুলো আসন জুড়ে বসেছে। সারা দেশটা লুটের রাজত্ব পেয়েছে। কি শেখাচ্ছে বলতে পারেন? চিয়াং কাইশেখ এসে বসেছে দিল্লীতে, জানেন! তলে তলে কী কাণ্ড সব হয়ে যাচ্ছে! আমার বন্ধু এসেছে পাহাড় থেকে। বলেছে চীনে গুণ্ডারা হিমালয়ের সবখানে জুড়ে বসেছে। চু-এন-লাইকে ব'লে পাঠিয়েছি ওসব গুণ্ডামী চলবে না। আমি খুন ক'রে ফেলব।……শান্তিনিকেতনে ওঁরা নাচ গান করছেন। সব দরবারে নেচেই বেড়াবে! 'ভাঙ্গরে পাষাণ কারা' বলেও ওরা নাচে! জলে যায়, শরীর জলে যায় ওদের কাণ্ড দেখে। যাব আমি সেখানে—জোর গলায় বলব—গুরুদেবের নামে ভিরমি খেয়ে নেতিয়ে প'ড়ে লোক ঠকানো আর চলবে না। শিশু থেকে আরম্ভ ক'রে আর সব বিভাগে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে, ছবি সম্বন্ধে, গান সম্বন্ধে, তাঁর চরিত্রের, তাঁর লেখা সৃষ্টির নানাদিকের নিয়মিত আলোচনা করতে হবে। সপ্তাহে এক বা একাধিক ক্লাস এজন্য সব বিভাগের সব শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য আমি খুলে দেব। পরীক্ষায় এ সম্বন্ধে অন্ততঃ একটা ক'রে পেপার থাকবে। সে ব্যবস্থা আমি ক'রে দেব। গুরুদেবের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা দেখানো হবে—শ্রদ্ধা করা হবে এতে। টাকার শ্রাদ্ধ হবে, ভোজ হবে, নাচ গানের আসর জমবে—বাতিকের কাজ করা নামাবলি গলায় ভক্ত ক'জনের পকেটে টাকা উঠবে—এই দিয়ে ওরা শ্রদ্ধা দেখাতে চায়—

স্বার্থপর ভাঙ্গর ওদের দাপট। নেহেরুকে বলেছি ওসব ধাপ্পায় ভুললে চলবে না। কিছু বোঝে না, যে যা বোঝাচ্ছে তাই বুঝে চলেছে এই সব মতলববাজদের দেশ থেকে দূর করে দেব। আন্দামানে থাক ওরা, দণ্ডকারণ্যে থাক—এখানে না। ঋষির আশ্রমে বুধ চ'রে বেড়াবে! আমি থাকতে তা হতে দেব না, দেখে নেবেন। আমি নতুন ক'রে আশ্রম খুলব, গুরুগৃহ, গুরুদেবের আদর্শে সব চলবে সেখানে। জানেন রবিঠাকুর অত বড় ধনীর দুলাল তবু ছোটবেলা কুস্তি ল'ড়ে শরীর তৈরি করেছিলেন, ঢ'লে ঢ'লে নেচে নয়। যত নষ্টামি! গলায় সুর বাজে না ব'লে আধুনিক গান করে; দেহের স্বাস্থ্য রক্ষা করতে পারে না, মুখে রং মেখে বলে সভ্য হয়েছি। সব নষ্টের গুরু ঐ রবিঠাকুর। লোভী, নামের লোভে শেষ বয়সে ছবির নামে অনাসৃষ্টি ক'রে গেছেন। চেলাচামুণ্ডরা তাই নিয়ে লাফাচ্ছে, আর দেশবিদেশে প্রদর্শনী দেখিয়ে বেড়াচ্ছে। যেমন মন তেমনি ছবি বেরিয়েছে, মুখোশ গেছে খসে। হবে না কেন নাম? সে আঁকবার কৌশলটাও এই শর্মারামের কাছেই শেখা। না হলে পাবেন কোথায়? ব'লে দিয়েছি নিজের নামে চালাবেন, খবদার আমার নাম না কেউ জানে। আপনারা রবিঠাকুরকেই চেনেন কিন্তু তাকে কবিতা লিখতে শিখিয়েছে কে? যে সব কবিতা ওঁর নামে ছাপা হচ্ছে সে-সব কার লেখা কবিতা জানেন? আমিই সে-সবের লেখক। আমার নাম ছাপাই নি—নোবেল প্রাইজ ঐ রবিঠাকুরকেই পাইয়ে দিলাম। এবার আপনাকে দেব। আমার সেই লেখাগুলো রবিঠাকুরকে দিই নি! ওগুলো অতি জটিল বৈজ্ঞানিক আলোচনা। গভীর ডাক্তারি-জ্ঞান থাকা দরকার। তাই ওঁর নামে সে-সব চলবে না; আপনার নামেই ছাপিয়ে দেব। নোবেল প্রাইজটা আপনারই হ'ক। আমার ওতে দরকার নেই। আমি অর্থ সম্মান এ সব বাজে জিনিস চাই না। আমায় লোকে চেনে না। আড়াল থেকে কাজ ক'রে যাই, আপনাকে আজ কিছু ব'লে ফেললাম। এ সব কথা প্রকাশ করবেন না। তা হলেই সর্বনাশ—খবরের কাগজে তো মাতামাতি শুরু হবে। বিশ্বশুদ্ধ লোক ক্ষেপে যাবে—অত হাঙ্গামা আমার ভাল লাগে না। অত বৈ চৈ করবার আমার সময় কোথায়? শুনলেন তো আমার ঐ প্রেম করবার সময়টুকুও নেই। মিনতি চ'লে গেছে। যাক্‌গে, যেখানে খুশি যাক। আমার তাতে কি? আমি তো তাকে কোনওদিন চাই নি! ও-ই তো আমাকে চেয়েছে—মিনতি করেছে। দেখে নেব এই নিষ্ঠুর দুনিয়াকে—যে, আমায় আঘাত করতে দ্বিধা করে নি। ধ্বংস ক'রে দেব সব। এক সূর্যের বদলে হাজার সূর্য সৃষ্টি ক'রে পুড়িয়ে মারব যা কিছু ক্লেদ জমা হয়েছে। হিরোশিমাতে কী আর হয়েছে—ছোট্ট একটু শহর। সারা বিশ্বে সেই দাবদাহ জলবে। আপনাকে আমার সঙ্গে নেব—আপনি ভাল লোক—আপনাকে আমার লেখা দেব।" মাখন থামতে চায় না। "আপনি ভাল লোক, বিদ্বান, বুদ্ধিমান, জানী। আপনাকে আমি খুব ভালবাসি। মিথ্যাকথা। ভালবাসা কেন? আপনি কে? আমাকে আপনি কী ভেবেছেন? জোচ্চোর কোথাকার। আপনি কত ভাল! একটুও রাগ করেন না। বাড়িতে বাবা-মাগুলো সব শয়তান। বাবাটা মরেছে—না হলে গলাটিপে মারতাম। আমাকে খুব ভালবাসত জানেন। কিন্তু বেঁচে নেই। মরে গেছে—বেঁচেছে। আজ আমাকে বেরুতে বারণ করেছিল। আমি কেন থাকব ঘরে ব'সে! আমাকে ওরা বন্দী ক'রে রাখতে চায়। আমি কি কয়েদী, আসামী, খুনে? খুন করলে পাপ হয়, ওরা জানে না তাই ভাবে এ সব। আমি মহৎ—চিনল না—আমায় চিনল না।" মাখন আবার কাঁদতে শুরু করল। আমি বিব্রত বোধ করছি, আর একটু সহানুভূতির সুরে তাকে শান্ত করবার চেষ্টা করছি। আমার কথা তার কানেই যায় না। সে আপন মনে কথা ব'লে যায়, না হয় চুপ ক'রে থাকে। বাংলা রাষ্ট্রভাষা হ'ল না, আমার জীবনের সব সাধনা ব্যর্থ হয়ে গেল। কী নিয়ে থাকব?

কী ক'রে আর বাঁচব! রবিঠাকুর তুমি গুরুদেব সেজে পুজো পেয়ে সুখী হয়ে রইলে। তোমার আগুন নিভে গেছে। কোথায় তোমার সে বিদ্রোহ? অন্যায়ের বিরুদ্ধে তুমি সারাজীবন লড়াই করেছ, এখন কৌশলে ওরা তোমায় গুরু বানিয়ে দিয়ে তোমার বিদ্রোহের শক্তি লোপ ক'রে দিয়েছে। তুমিও পুজোয় ভুললে! বাংলাভাষা সম্বন্ধে তুমিই তো গলা ছেড়ে জয়গান করেছিলে। সব গেল, আমি কী নিয়ে এখন থাকি! আমি প্রাণ দিয়ে চেয়েছিলাম বাংলাভাষা জগতের ভাষা হবে। হ'ল না। হবে, হবে, একদিন হবে। চিনছে। লোকে চিনবে—সেদিন আসছে!" একবার উঠে পায়চারি করতে শুরু করল। তাকে বলেছি বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম কর, অনেক তো ঘুরেছ। রাত অনেক হ'ল। সে কোনও জবাব না দিয়ে কেবল 'হুঁ' ব'লে যেমন পায়চারি করছিল তেমনি করতে থাকল। মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে স্থির ভাবে আকাশের দিকে চেয়ে থাকে। বসে এবার গুণগুণ ক'রে গানের সুর ভাঁজতে লাগল—মাঝে মাঝে থেমে কি যেন বলে—স্পষ্ট শোনা যায় না।

রাত অনেক হয়েছে—কিছুক্ষণ হ'ল বেশ তন্দ্রা ঘনিয়ে আসছিল। একটু ক্ষণ বোধহয় ঘুমিয়েই পড়েছিলাম। প্রায় চমকে উঠলাম যখন মাখন আমার গায়ে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দিলে। শুনি ও ব'কে চলেছে···"ভাল ক্রিকেট প্লেয়ার। বেচারা সেদিন দেখি ময়দানে ফ্যাকেটে মরছে। তা আর হবে না! খেলা ছেড়ে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হয়ে বসেছেন। যেমন কর্ম তেমনি ফল। বেশ হয়েছে। টেবিলে ব'সে ব্যাট চালাও। যুদ্ধং দেহি! গোঁয়ার চ্যাংরা কোথাকার। তোমাদের ধ্বংস আমার হাতে। কচি বয়েস, কী সুন্দর চেহারা! আমি মেয়ে হলে ওকে বিয়ে করতাম। প্রাণ ভ'রে ভালবাসতাম। মেয়েরা ভালবাসতে পারে না—আমি ওদের দেখিয়ে দিতাম কেমন ক'রে ভালবাসতে হয়। বন্দুক কামান তৈরি করছে ব'সে ব'সে, রাক্ষসের দল। করুক যত পারে, মরবে মরবে, ওরা মরবে। আমার কথা আপনি দেখে নেবেন। ওরা কত বড় কর্মীর জাত। বড় হবে না! ওরা বড় হবে না তো হবে কে? আপনি কী করেন? ডাক্তারি করেন, কত টাকা কী নেন? গরীবের দুঃখ বোঝবার মন আপনার আছে কি? টাকা টাকা টাকা—লোভী, পকেটের দিকে লক্‌লকে চোখ ছুটো মেলে রোগী দেখেন! যত সব শা···, শু··· ভিড় জমিয়েছে! আপনি কত ভাল, কত শান্ত। সব ভণ্ড জুতো পেটা ক'রে দূর করব। আপনি মহৎ, পাপ ক'রে ফেলছি, আমায় ক্ষমা করুন"—বলেই, মাখন আবার আমার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে চুপ ক'রে রইল।

কোনদিনই এত রাত পর্যন্ত বাইরে ব'সে থাকি না, বিশেষ ক'রে এই ঠাণ্ডার দিনে। ভেতরে গৃহিণী বোধহয় একঘুম দিয়ে উঠে বিছানাখানি দেখে আকাশ পাতাল ভেবে দরজার ফাঁকে দু'জনকে ঐ অবস্থায় দেখে থাকবেন। ভেতর থেকে চাপা কথা শুনলাম "এত রাতে ব'সে ব'সে গুরুমন্ত্র দেওয়া হচ্ছে—আর সময় জুটল না।" নিরুপায় ভাবে কানে কথা শুনলাম, মনে মনে জ্বালাটাও অনুভব করলাম কিন্তু যেমন ব'সে ছিলাম তেমনি ব'সে রইলাম। নড়তেও পারলাম না, মাখনকে আর কিছু বলতেও পারলাম না। একটি অবোধ শিশু অসহায়ভাবে আমার কাছে ব'সে কখনও হেসে, কখনও কেঁদে, কখনও রেগে সৃষ্টি ধ্বংস করতে যে প্রলয়কাণ্ড ক'রে চলেছে তাকে কী বলব? সে কি বুঝবে? কে তাকে বোঝাবে, কী বোঝাবে? সে যে-জগতে বাস করে তার রূপ আলাদা, তার রীতি আলাদা, নীতি আলাদা। সে-জগতের বাস্তবরূপটাই যে আমাদের কল্পনার বাইরে। আমি যা নিজে বুঝি না তা অন্যকে বোঝাব কেমন ক'রে। তাকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। মনে হচ্ছিল কে বেশী অসহায়? মাখন, না আমি? সে যা বলে তা সে জানে ব'লে, বুঝতে পারে ব'লে, বলতেও পারে। আমি তো কোনওটাই পারছি না।

ইচ্ছা হচ্ছিল মা যেমন ব্যথিত সন্তানের মাথায় গায়ে শান্তির হাত বুলিয়ে তাকে শান্ত করেন তেমনি তার মাথায় গায় হাত বুলিয়ে দিই, বলি ঘুমা ঘুমা ঘুমা। কিন্তু না পারলাম কিছু বলতে, না পারলাম কিছু করতে। স্থির হয়ে বসেই রইলাম। বেশ কিছুক্ষণ সময় এইভাবেই কেটে গেল। আকাশের চাঁদ পাশের বাড়ির আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে। সামনের রাস্তায় ছায়া পড়েছে। রাত্রি যেন ধীরে ধীরে তার দখল বিস্তার ক'রে চলেছে। মাঝে মাঝে রাস্তার ধারের গাছের ডালে কাক বা আর কোনও পাখি একটু উসখুস ক'রে ন'ড়ে বসেছে। কালো আকাশ, হালকা কুয়াশার ক্ষীণ অন্তরালের ওপারে কয়েকটি তারা মিট মিট করছে। এতবড় কলকাতার কর্মব্যস্ত শহর যেন ক্ষণেকের জন্য ঘুমিয়ে পড়েছে। নিস্তব্ধ রাত্রে মানুষ নিজের মধ্যে কখন তলিয়ে যায় তা সে জানতেও পারে না। সে-আবেশ ভাঙালো মাখন। এ যেন অন্য এক মানুষ। অতি ধীর বিনীত স্বরে বললে—"ডাক্তারবাবু, আপনাকে আজ অনেক কষ্ট দিয়েছি। কিছু মনে করবেন না। বলুন আপনি আমায় ক্ষমা করছেন! আপনার মার্জনা নিয়ে আমি আবার পথে নামব। চলতে থাকব। দেখি, আমার জীবন আমাকে কোথায় নিয়ে যায়? এ আমার এক কঠোর পরীক্ষা চলছে নিজেকে নিয়ে। আমি জীবনের সত্য জানতে চাই। রাত অনেক হ'ল আপনি বিশ্রাম করুন। কাল সময় পেলে একবার মনে করবেন। মাখন জীবনের সত্য জানবার জন্য পথে বেরিয়েছে। এ পৃথিবীতে অন্যায় অবিচার জ'মে জ'মে পাহাড় গ'ড়ে উঠেছে, তারও মধ্যে সত্য আছে। আমি মাঝে মাঝে তার গোপন কথা শুনতে পাই।" এই ব'লে মাখন অতি শান্ত মধুর একটু হাসল। বললে আমার নাম মাখন, মনটাও আমার মাখনের মতই নরম। স্নেহের উত্তাপে গ'লে যায়। তাই আপনার কাছে এসে আমি শান্তি পেলাম। আমার কথা কেউ শোনে না। সবাই ভাবে আমি পাগল। এক সময় কলেজের বন্ধুরা ভাল ছাত্র ব'লে খাতির করত। প্রফেসরদেরও স্নেহ ও শুভেচ্ছা প্রচুর পেয়েছি। ভালভাবে পাশও করেছি—বিশ্ববিদ্যালয়ের সবগুলো পরীক্ষায়। তারপর টাকা রোজগারের জন্য লাগলাম। দেখলাম সংসারে নানারকমের টানাপোড়েন। জীবনের অর্থ খুঁজতে লাগলাম। সত্য কী, শান্তি কোথায় খুঁজতে লাগলাম। আগুন জ্বলে উঠল অন্তরে আমার, আমাকে পুড়িয়ে সে খাঁটি ক'রে তুলবে। জ্বলছে সে-আগুন! আমি তাই পথে···"

তার কথা শেষ হ'ল না। দুজন পথিক টর্চ আর লাঠি হাতে নিয়ে বারান্দার পাশ দেঁসে যাচ্ছিল, হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গলার স্বর শুনে একজন ব'লে উঠলেন—"কে? মাখন, তুই এখানে? বেরিয়ে আয় শীগ্‌গির! খুঁজে খুঁজে রাত কাবার হতে চলল, হতচ্ছাড়া কোথাকার, বেরিয়ে আয়! গলার স্বর তাঁর রুক্ষ, পরিশ্রান্তও মনে হ'ল। সঙ্গী বৃদ্ধ বলেই মনে হ'ল—বোধহয় প্রায় ৬০ বছর বয়েস হবে, কিংবা রাতের অন্ধকারে ঐ অবস্থায় তাকে একটু বেশী বৃদ্ধ বলেই মনে হয়েছিল। কণ্ঠে স্নেহের স্বর, ভাবাবেগে ঈষৎ কাঁপল যেন। বললেন "মাখন বাবা বাড়ি চল, রাত যে অনেক হ'ল। তুমি না গেলে আমরা কেউ তো ঘুমোতে পারি না, তুমি তো জান বাবা! চল, যাই।" এবার মাখন আমার কাছে সরে এসে আবার প্রণাম ক'রে আস্তে আস্তে রাস্তায় নেমে গেল। বৃদ্ধ ভদ্রলোক আমায় বললেন "কিছু মনে করবেন না, আপনাকে হয়তো অনেক জ্বালিয়েছে; ওর এই দশা, আমাদের ভাগ্য। মানুষ করতে চেয়েছিলাম—" বৃদ্ধ চোখ মুছলেন, নমস্কার ক'রে মাখনের সঙ্গ ধরতে দ্রুত চলে গেলেন। মাখন তখন কয়েক পদ এগিয়ে গেছে। সব বাড়িতে তখন মধ্যরাত্রির নিদ্রালস নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে। গভীর রাত্রে জনশূন্য পথে বৃদ্ধ পিতা হারানো-সন্তানকে ফিরে পেয়ে, ঘরে ফিরে চলেছেন। কতদূর বাড়ি জানি না। মনটা হঠাৎ যেন শূন্য হয়ে গেল। তার মধ্য থেকে বৃদ্ধ পিতার ক্ষীণ স্বর আবার যেন শুনতে পেলাম—"মানুষ করতে চেয়েছিলাম—"

অনুবাদ—

অহম্ এবং অদস্

(২)

সিগমুণ্ড ফ্রয়েড্

রোগবিদ্যা-সম্বন্ধীয় (pathological) অনুসন্ধানকার্য আমাদের দৃষ্টিকে একান্তভাবে অবদমিতের (repressed) প্রতিই নিবদ্ধ করেছে। সত্যকারের নির্জ্ঞান বলতে যা বোঝায় অহম্ যে সেই রকমও হতে পারে এই তথ্যটি জানার ফলেই অহম্ সম্বন্ধে আমরা আরও জানতে চাই। এ পর্যন্ত আমাদের অনুসন্ধানকার্যে যা একটিমাত্র পথপ্রদর্শক ছিল সেটি হ'ল সজ্ঞান বা নির্জ্ঞানের নিরূপক লক্ষণ ; কিন্তু শেষ-পর্যন্ত আমরা দেখলাম যে এই নিরূপক লক্ষণটিও অস্পষ্ট (ambiguous)।

আমাদের যা কিছু জ্ঞান তা কেবল সজ্ঞানের সঙ্গেই যুক্ত। এমন কি নিন সম্বন্ধে যে-জ্ঞান তাও তাকে সজ্ঞানে রূপান্তরিত করেই তবে লাভ হয়। কিন্তু মনে রাখা দরকার, সেটা কী ক'রে সম্ভব? "সজ্ঞানে রূপান্তরিত ক'রে" কথাটার তাৎপর্য কি? কি ভাবেই বা সেটা ঘটতে পারে?

যেখান থেকে এই প্রসঙ্গে আমাদের কাজ আরম্ভ করতে হবে তা আমরা ইতিপূর্বেই জেনেছি। আমরা বলেছি যে সজ্ঞান হ'ল মনোযন্ত্রের বহিরঙ্গ (superficies); অর্থাৎ আমরা এটাকে বহির্জগতের সবচেয়ে কাছে অবস্থিত তন্ত্রটির একটি বৃত্তি (a function to the system which is situated nearest to the external world) ব'লে ধ'রে নিয়েছি। প্রসঙ্গত বলি যে, এ ক্ষেত্রে সাংস্থানিক (topographical) পরিভাষাটি যে কেবল বৃত্তিটির যথার্থ ব্যাখ্যাই করে তা নয়, উপরন্তু, শারীরস্থানীয় ঘটনাবলীর সঙ্গে সত্যিসত্যিই সামঞ্জস্যও বজায় রাখে।[১] আমাদের অনুসন্ধানকার্যও প্রত্যক্ষানুভূতির এই বহিরঙ্গটি থেকেই আরম্ভ করতে হবে।

বহির্জগৎ থেকে (ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ-sense perceptions) এবং অন্তর্জগৎ থেকে যে-সব প্রত্যক্ষ-জ্ঞান আমরা প্রাপ্ত হই—যেগুলিকে যথাক্রমে আমরা সংবেদন এবং অনুভূতি বলি—তা সবই শুরুতে সন-ই থাকে। কিন্তু, সেই সব আভ্যন্তরীণ ক্রিয়াকলাপগুলি (processes) যেগুলিকে আমরা মোটামুটি-ভাবে কোনও মতে (vaguely and inexactly) চিন্তাধারা এই নাম দিতে পারি, তাদের বেলায় কি হবে? এইগুলি হ'ল মানসিক শক্তির অভিক্রান্তি (displacement), মনঃশক্তি কার্যে পরিণত হবার পথে মনোযন্ত্রের অভ্যন্তরে এই অভিক্রমণ সম্পাদিত হয়েছে। তবে কি তারা বহিরঙ্গের দিকে অগ্রসর হয়, যার ফলে সজ্ঞানের ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্তি ঘটতে থাকে? অথবা সজ্ঞানই এগুলির দিকে অগ্রসর হয়? যখন কেউ মনোজগতের দৈশিক (spatial) বা সাংস্থানিক ধারণাটিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বিচার করতে আরম্ভ করে তখন এই সমস্যাটি-ই অন্যান্য অনেক সমস্যার মধ্যে অন্যতম রূপে দেখা দেয় (spring up)। এই দুটিই ঘটবার সম্ভাবনা সমভাবে অসম্ভাব্য; এই প্রশ্নের সমাধানের জন্য নিশ্চয়ই অন্য কোনও তৃতীয় উপায় (contingency) আছে।

অনুবাদ : সোমনাথ ভট্টাচার্য ও সন্ধ্যা ভট্টাচার্য

১ *Beyond the Pleasure Principle.*

আমি ইতিপূর্বেই আর এক জায়গায়[১] বলেছি যে একটি নিন ভাব এবং একটি আ-সন ভাবের (চিন্তা) মধ্যে প্রকৃত পার্থক্য হচ্ছে এই রকম : প্রথমটি একটি অচেনা-অজানা (unrecognized) সত্তার (material) উপর পরিস্ফুট হয়, আর শেষেরটির (আ-সন) অধিকন্তু কতকগুলি বাচিক প্রতিরূপের (verbal images) সঙ্গে সংস্রব থাকে। এই হ'ল, সজ্ঞানের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ ব্যতিরেকে, নিন ও আ-সনের বৈশিষ্ট্য নিরূপণের প্রথম প্রচেষ্টা। তা হলে, এখন, 'কী ক'রে একটা জিনিস সজ্ঞান হয়?' আরও সুবিধাজনকভাবে প্রশ্ন করা যায় 'কী ক'রে একটা জিনিস আ-সজ্ঞান হয়?' এবং তার জবাব হবে : 'প্রাসঙ্গিক বাচিক প্রতিরূপগুলির সংস্রবে এসে।

এই বাচিক প্রতিরূপগুলি হ'ল স্মৃতি-শেষ (memory-residues) ; তারা এক সময়ে প্রত্যক্ষ-জ্ঞান রূপে ছিল, এবং সব স্মৃতি-শেষের মতই এইগুলিও আবার সজ্ঞান হতে পারে। এদের প্রকৃতি সম্বন্ধে আরও বেশী ক'রে চর্চা করবার আগে যেন এক নতুন তথ্য আবিষ্কারের মতো আমাদের মনে উদয় হয় যে, যেটা এক সময় সন-অংশে প্রত্যক্ষরূপে বিদ্যমান ছিল সেইটেই কেবল সজ্ঞান হতে পারে, এবং যে-কোনও জিনিসই (অনুভূতি ছাড়া) যা ভেতর থেকে ওঠে এবং যা সজ্ঞান হতে চায় তাকে বাইরের প্রত্যক্ষজ্ঞানে রূপান্তরিত হবার জন্য সচেষ্ট হতে হবে ; এটা ঘটা সম্ভব স্মৃতি অবশেষের (memory traces) সাহায্যে।

আমাদের ধারণা যে স্মৃতি-শেষগুলি এমন এক জায়গায়(system) অবস্থিত যেটা pcpt-সন'র সঙ্গে সরাসরিভাবে সংলগ্ন, যাতে ক'রে স্মৃতি-শেষের নিজস্ব আধানশক্তি (cathexes) সহজেই এই শেষোক্ত অঞ্চস্থিত বিষয়গুলিতে সঞ্চারিত হতে পারে। এইখানে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অমূল-প্রত্যক্ষের (hallucination) কথা মনে পড়ে, আরও মনে পড়ে যে অত্যন্ত স্পষ্ট যে স্মৃতি সেটাকে সব সময়েই অমূল-প্রত্যক্ষ এবং বাহ্য (external) প্রত্যক্ষের থেকে পৃথক করা যায় ; আবার এটাও আমরা দেখতে পাব যে, যখন কোনও একটা স্মৃতি জাগরিত হয় তখন সেই স্মৃতি-তন্ত্রের (memory-system) নিজস্ব আধানশক্তি কার্যকর থাকে। তবে আসল প্রত্যক্ষের থেকে পৃথক করা যায় না এমন এক অমূল-প্রত্যক্ষ তখনই ঘটতে পারে যখন আধানশক্তি যে কেবল স্মৃতি-অবশেষ থেকে আরম্ভ ক'রে প্রত্যক্ষের (Pcpt element) উপর অবধি ব্যাপ্ত হয়ে থাকে তা নয়, একেবারে পুরোপুরি তার উপর স্থানান্তরিত হয়ে যায়।

বাচিক অবশেষগুলি প্রধানতঃ শ্রাবণ (auditory) প্রত্যক্ষের থেকেই উৎপন্ন, অতএব দেখা যাচ্ছে যে 'আ-সন' সংগঠনটির (the system Pcs) যেন একটা বিশেষ সংবেদ-উৎস আছে। বাচিক প্রতিরূপের দার্শন উপাদানগুলি (visual components) হ'ল গৌণ, পঠনের মধ্য দিয়ে আয়ত্বীকৃত, এগুলিকে এখন, গোড়ার দিকে এক পাশে সরিয়ে রাখা চলতে পারে ; সেই রকম, কালা-বোবাদের ক্ষেত্র ছাড়া অন্যান্য জায়গায় শব্দের সংবেদ-চেষ্টায় (sensory-motor) প্রতিরূপগুলিও যেন, এক রকমের স্বল্প-সাহায্যকারীর কাজ করে এই রকম ধ'রে নেওয়া যেতে পারে। তা হলে শেষপর্যন্ত এই দাঁড়াল যে শ্রুত-কথার স্মৃতি-অবশেষই হ'ল সেই কথাটির সারমর্ম।

কেবল সরল ব্যাখ্যার অজুহাতে চাক্ষুষ স্মৃতিশেষগুলির গুরুত্ব—অর্থাৎ বস্তুর (শব্দ থেকে ভিন্ন) গুরুত্ব—ভুলে গেলে আমাদের চলবে না—অথবা এও না মানলে চলবে না যে চিন্তাধারাগুলির পক্ষে দার্শন-

১ 'The Unconscious' (১৯১৫) *Collected Papers*, ৪র্থ খণ্ড

অবশেষে পরাবর্তন (reversion)-দ্বারাই সংজ্ঞান হওয়া সম্ভব, আর অনেকের কাছেই এটি একটি প্রিয় পদ্ধতি ব'লে মনে হয়। জে. ভেরেনডঙ্ক (J. Varendonck)-এর মতানুসারে স্বপ্ন এবং আসংজ্ঞান মনঃস্পষ্টগুলি (phantasy) আলোচনা করলে এই চাক্ষুষ চিন্তাক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আমাদের একটা ধারণা হবে। তা থেকে আমরা জানতে পারব যে যা কিছু সংজ্ঞানে পরিণত হয় তা হ'ল, বিধিতঃ, চিন্তার একটি মূর্ত (concrete) বিষয়বস্তু মাত্র, এবং এই বিষয়বস্তুর বিভিন্ন উপাদানগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক, প্রকৃতপক্ষে যা চিন্তাধারাকে তৈরি করে, তাকে চাক্ষুষ-রূপে প্রকাশিত করা যায় না। অতএব, চিত্রের সাহায্যে চিন্তা করাটা হ'ল, সংজ্ঞান হবার একটা খুবই অসম্পূর্ণ উপায়। একদিক দিয়ে, বাক্যের সাহায্যে চিন্তা করার চেয়ে এটারই বরং বেশী মিল আছে নির্জ্ঞান-ধারার সঙ্গে, এবং ব্যক্তিজনিবিদ্যামতে (ontogenetically) আর জাতিজনিবিদ্যামতেও (phylogenetically) এটিই নিঃসন্দেহে প্রাচীনতর।

তারপর যা বলছিলাম : তা হলে, যদি এই পদ্ধতিতে, যা স্বভাবতঃ নির্জ্ঞান সেটা আসংজ্ঞান হতে পারে, তবে অবদমিত কোনও কিছুকে কি ক'রে যে (আ)-সন করা সম্ভব যে প্রশ্নটিরও সমাধান হবে নিম্নলিখিতরূপ। ঠিক যেমনটি যোগসূত্রের কথা আমরা এতক্ষণ আলোচনা করেছি সেই প্রকারের আসন-যোগসূত্রগুলিকে যদি সমীক্ষণকালে সরবরাহ করা যায় তবেই এটি হতে পারে। কাজেই সংজ্ঞান যেখানে আছে সেইখানেই রইল ; ওদিকে কিন্তু নিনও সন ক্ষেত্রে উদিত হ'ল না।

এদিকে বহিঃ-প্রত্যক্ষের সঙ্গে অহমের সম্পর্কটি খুবই সুস্পষ্ট কিন্তু আন্তর-প্রত্যক্ষের সঙ্গে অহমের সম্পর্কটি বিশেষ পর্যবেক্ষণ-সাপেক্ষ। এর ফলে আবার একটা সন্দেহের সৃষ্টি হচ্ছে এই ভেবে যে, সমস্ত সংজ্ঞান-ক্ষেত্রটিকে কেবলমাত্র এই আপাত Pcpt-সন-এর সঙ্গে এক করা সত্যিই যুক্তি-সঙ্গত হ'ল কিনা।

মনের বিভিন্ন এবং নিঃসন্দেহেই গহনতম স্তরে যে-সব ধারা উৎসৃত হয়, আন্তর-প্রত্যক্ষগুলি সেইগুলিরই সংবেদন সৃষ্টি করে। এই সমস্ত সংবেদন এবং অনুভূতিগুলি সম্বন্ধে খুব কমই জানা গেছে ; এবং সবচেয়ে ভাল যে উদাহরণগুলি আমরা পাই সেগুলি এখনও ঐ সুখ-দুঃখ (pleasure-pain)-সূত্র-সম্পর্কিত মাত্র। এগুলি, বহির্জগৎ থেকে উৎপন্ন প্রত্যক্ষের চেয়ে আরও মৌলিক, আরও প্রাথমিক, এমন কি যখন সংজ্ঞান মেঘাচ্ছন্ন থাকে তখনও এদের উদয় হতে পারে। অন্যত্র আমি এদের বিরাট্ মাত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং তার অধিমনোবিদ্যা (metapsychological)-সম্পর্কিত ভিত্তির বিষয়ে আমার মতামত বলেছি। এই সমস্ত সংবেদনগুলির উৎস বহিঃপ্রত্যক্ষের মতনই বহুমুখী ; তারা যুগপৎ বিভিন্ন জায়গা থেকে আসতে পারে এবং ফলে বিভিন্ন, এমন কি বিপরীত-গুণ-সমন্বিতও হতে পারে।

সুখদ সংবেদনগুলির মধ্যে এমন কোনও অধিষ্ঠিত গুণ নেই যার ফলে এগুলোকে ভাল লাগতেই হবে, কিন্তু 'বেদনাদায়ক' সংবেদনগুলির মধ্যে এইরকম একটি অধিষ্ঠিত গুণ যথেষ্ট পরিমাণেই আছে। এই শেষোক্তগুলি জোর দেয় পরিবর্তনের দিকে, এবং মোক্ষণের (discharge) দিকে, আর সেই কারণেই আমরা বেদনাকে আধানশক্তির (cathexis) বৃদ্ধিকারক এবং আনন্দকে হ্রাসকারক ব'লে ব্যাখ্যা করি। যা কিছু আনন্দ এবং 'বেদনা'-রূপে সংজ্ঞাত হয় সেগুলিকে আমরা না হয় মনের একটা অনিশ্চিত মাত্রিক (quantitative) এবং আঙ্গিক (qualitative) উপাদান ব'লে ধ'রে নিলাম ; তা হলে প্রশ্ন দাঁড়ায় এই যে, ঐ উপাদানটি কি যেখানে আছে ঠিক সেইখানে থেকেই সংজ্ঞাত হতে পারবে, না তাকে প্রথমে Pcpt-তন্ত্রে স্থানান্তরিত করতে হবে।

রোগপরীক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতা শেষেরটির পক্ষেই রায় দেয়। এই অভিজ্ঞতার ফলে আমরা দেখতে পাই যে, এই অনিশ্চিত উপাদানটি ঠিক অবদমিত আবেগেরই মতো আচরণ করে। অহমের অলক্ষ্যেই এটি নোদনাশক্তি (driving force) প্রয়োগ করতে পারে। অবশ্য যতক্ষণ পর্যন্ত না অনুকর্ষীর (compulsion) সামনে কোনও প্রতিবন্ধ এসে উপস্থিত হয় এবং মোক্ষণ-প্রতিক্রিয়ায় বাধা পড়ে, ততক্ষণ সেই অনিশ্চিত উপাদানটি 'বেদনা'-রূপে সংজ্ঞাত হয়ে ওঠে না। ঠিক যেমনভাবে দৈহিক প্রয়োজনের তাগিদে উৎপন্ন পীড়ন (tension) নির্জ্ঞাত থাকতে পারে তেমনি দৈহিক বেদনাও—যেটা হ'ল বাহ্যিক এবং আন্তর-প্রত্যক্ষের মধ্যবর্তী একটা জিনিস, যেটা কার্যতঃ আন্তর-প্রত্যক্ষেরই মতো যদিও তার উৎপত্তিস্থল হ'ল বহির্জগৎ,—সেটাও নির্জ্ঞাত থাকতে পারে। সেই পুরানো কথাই আবার বজায় রইল তা হলে, যে, সংবেদন এবং অনুভূতিগুলি একমাত্র Pcpt-সন তন্ত্রের মাধ্যমেই সংজ্ঞাত হতে পারে। যদি এদের অগ্রগতির পথ রুদ্ধ থাকে তবে এরা সংবেদন-রূপটি পরিগ্রহ করতে পারে না যদিও এদের সংশ্লিষ্ট অনিশ্চিত উপাদানগুলি, তারা সংবেদন হলে যেমন হ'ত ঠিক তেমনি থাকে। আমরা তা হলে পুরাপুরি নির্ভুলভাবে না হলেও সংক্ষেপে কোনও রকমে নির্জ্ঞাত ধারণাগুলির সঙ্গে মিল দেখিয়ে 'নির্জ্ঞান অনুভূতির' কথা বলতে পারি, যদিও কথাটা একেবারে পুরাপুরি যুক্তিযুক্ত নয়। প্রকৃতপক্ষে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, যেমন নিন ধারণাগুলি সন ক্ষেত্রে আসবার আগেই তাদের যোগসূত্রগুলি তৈরি হয়ে থাকা চাই, তেমনি কিন্তু অনুভূতিগুলির জন্যে ঐ সবের কোনও প্রয়োজন নেই, কেননা এরা সরাসরিই চ'লে আসতে পারে। অথবা, এই ভাবেও বলা যায় : অনুভূতির ক্ষেত্রে সন এবং আ-সন-এর মধ্যে তফাৎ করার কোনও মানেই নেই ; আ-সন এখানে গৌণ কেন না অনুভূতিগুলি হয় সংজ্ঞাত না হয় নির্জ্ঞাত। এমন কি যখন এরা বাচিক প্রতিরূপের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তখনও এদের সংজ্ঞাত হবার জন্য সেই অবস্থা দায়ী নয়—এরা নিজেরাই সংজ্ঞাত হতে পারে।

এতক্ষণে বাচিক প্রতিরূপের কার্যকলাপ বেশ সুস্পষ্ট হ'ল। এদের মধ্যস্থতার ফলেই আন্তর চিন্তা-ধারাগুলি প্রত্যক্ষরূপ ধারণ করে। সমস্ত জ্ঞানের উৎপত্তি যে বহিঃপ্রত্যক্ষে এটা হ'ল সেই উপপাদ্যেরই (theorem) প্রতিপাদন। অনেক সময় আবার এমন ঘটে যে চিন্তাধারার একটা অতি-আধানতা (hyper cathexis) ঘ'টে যায়, যে-ক্ষেত্রে চিন্তাকে যেন সত্যিসত্যিই একেবারে প্রত্যক্ষ করা যায়—মনে হয় যেন সেগুলি বহির্জগৎ থেকেই এসেছে এবং তার ফলে সেগুলিকে সত্যি ঘটনা বলেই মনে হয়।

বাহ্যিক এবং আন্তর প্রত্যক্ষের সঙ্গে এই বহিঃস্থ (superficial) Pcpt-সন-তন্ত্রের যে কী সম্পর্ক সেটা সুস্পষ্ট ক'রে নিয়ে এবার তবে আমরা অহম্ সম্বন্ধে আমাদের অনুসন্ধান চালিয়ে যাবার চেষ্টা করতে পারি। অহমের যাত্রা শুরু হয় নিঃসন্দেহে Pcpt-তন্ত্ররূপী নিউক্লিয়স (nucleus) থেকেই এবং স্মৃতি-অবশেষগুলির সঙ্গে সংলগ্ন আ-সনকে পরিবৃত (embracing) ক'রে। কিন্তু আমরা আগেই জেনেছি যা তাতে অহমও হচ্ছে নির্জ্ঞাত।

অহম্-ও হচ্ছে নির্জ্ঞাত। আমার মনে হয় এবার একজন লেখকের মতামত অনুসরণ করলে আমরা বেশ খানিকটা লাভবান হতে পারব, যিনি কোনও ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে বৃথাই জোর দিয়েছেন যে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের সঙ্গে তাঁর নাকি কোনই সম্বন্ধ নেই। জর্জ গ্রডেকের (Georg Groddeck) কথা বলছি, ইনি এই কথাটা বলতে কখনও ক্ষান্ত হন নি যে, যেটাকে আমরা অহম্ বলি সেটার আচরণ আমাদের সারা জীবনব্যাপীই একেবারে নিষ্ক্রিয়, এবং তাঁর বলবার কথাটা তিনি এইভাবে বলেছেন, যে,

বহু অজ্ঞাত এবং অপ্রতিরোধ্য শক্তির দ্বারাই তবে আমাদের 'বাঁচিয়ে রাখা' হচ্ছে।[১] আমাদের সকলেরই [কখনও কখনও] এই রকম মনে হয়েছে যদিও সেটা অন্যান্য সব অভিজ্ঞতাগুলিকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবার মতো অভিভূত আমাদের করতে পারে নি, এবং গ্রন্থেকের আবিষ্কারকে বিজ্ঞানের হর্ম্যমন্দিরে (fabric) একটা স্থান দিতে আমাদের দ্বিধা নেই। আমি এই মতটিকে বজায় রাখতে চাই এই ব'লে যে, যে-সত্তাটুকু Pcpt-তন্ত্র থেকে স্ফুরিত [উদ্ভূত—starts out] হয়ে আ-সন-রূপে কাজ শুরু করল সেটাকে বলি অহম্ (ego) এবং গ্রন্থেকের মতানুসারে, সন-এর বাকি অংশটিকে, যার মধ্যে এই সত্তাটুকু বিস্তৃতি লাভ করে এবং যেটা এমন ব্যবহার করে যেন ঠিক নিন, সেটাকে নাম দি অদস্ (Id-Es)[২]

শীঘ্রই আমরা দেখতে পাব যে এই ধারণাটি দিয়ে আমাদের বোঝবার পক্ষে বা বর্ণনা করার পক্ষে কোনও সুবিধে হ'ল কিনা। এখন আমরা লোকের মনটাকে অজ্ঞাত এবং অচেতন অদস্-রূপে গণ্য করব, যেটার বাহ্যিক আবরণের উপর হ'ল নিউক্লিয়স-রূপী Pcpt-তন্ত্র থেকে সৃষ্ট ও পরিপুষ্ট অহমের স্থান। এই জিনিসটাকে যদি একটা ছবির সাহায্যে বোঝবার চেষ্টা করি তবে আমরা এইটুকু আরও যোগ ক'রে বলতে পারি যে অহম্ অদসের সমস্ত অংশ পরিব্যাপ্ত করে না, শুধুমাত্র তার যে অংশটায় Pcpt-তন্ত্র একটা আবরণ সৃষ্টি করেছে সেইখানেই সে বিরাজ করছে ঠিক ওভম-এর (ovum) উপর বৈজিক আস্তরণ (germinal layer) যেমন থাকে অনেকটা সেই রকম। অহম্ অদস্ থেকে একেবারে রীতিমতভাবে বিচ্ছিন্ন নয়; এর নিম্নাংশ অদসের সঙ্গে মিশে গেছে।

আবার অবদমিত সবকিছুও অদসের মধ্যে মিশে যায় এবং তারই একটা অংশ হয়ে যায়। যা কিছু অবদমিত সেটাকে অহমের থেকে রীতিমতভাবে বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখে কেবল অবদমনেরই সংশ্লিষ্ট প্রতিবন্ধগুলি (resistances of repression); এটা অদসের মাধ্যমেই অহমের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারে। এটা বুঝতে মোটেই দেরী হয় না যে আমাদের রোগবিদ্যা-লব্ধ অভিজ্ঞতার সাহায্যে আমরা যে-সব সীমারেখা টানতে পেরেছি তার প্রায় সবগুলিই মনোযন্ত্রের শুধু উপরের আবরণাংশগুলির সঙ্গেই সম্পর্কিত—কেবল যেগুলির সম্বন্ধে আমরা সজ্ঞাত। এতক্ষণ যে সমস্ত জিনিসগুলি বর্ণনা করা হ'ল সেগুলিকে চিত্রাকারে প্রকাশ করা চলে (১নং ছবি); যদিও এই যে আকারটা আঁকা হয়েছে এটার যে কোনও বিশেষ ব্যবহারিকতা আছে এমন কোনও দাবী করা হচ্ছে না, তবে শুধুমাত্র ব্যাখ্যানের উদ্দেশ্যেই এটা করা হয়েছে। আমরা হয়তো বা আরও একটু যোগও করতে পারি, যে অহমের একটি শ্রাবণ অংশ আছে (the ego wears an auditory lobe)—গুরুমস্তিষ্কের অ্যানাটমি (cerebral anatomy) থেকে আমরা জানতে পারি যে এটা শুধু একদিকেই আছে। এটা যেন একদিকে বেঁকা ভাবে রয়েছে বলা যায়।

১ জি, গ্রন্থেক Das Buch vom Es, ভিয়েনা, ১৯২৩

২ গ্রন্থেক নিজে নিঃসন্দেহে Nietzsche-রই অনুসরণ করেছিলেন, যাঁর একটা অভ্যাস এই ছিল যে, যা স্বভাবতই আমাদের মধ্যে নৈর্ব্যক্তিক (impersonal) তথা প্রাকৃতিক নিয়মের বশবর্তী (subject to natural law) সেটাকে বোঝবার জন্যে এই ব্যাকরণ-সম্মত (grammatical) পদটি ব্যবহার করা।

[জার্মাণ ভাষার *'Es'* শব্দটির প্রকৃত অর্থ হ'ল ইংরেজী *'it'* (ইহা), লাটিন ভাষার ঠিক অনুরূপ শব্দ *'id'* (অদস্)-টিকে গ্রহণ করা হয়েছে *'ego'* (অহম্)-র সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে যেটা আবার জার্মাণ *'Ich'* (মানে 'I'—আমি)-এর সর্বস্বীকৃত ভাষান্তর।—ইংরেজী অনুবাদক।]

এটা সহজেই দেখা যায় যে, অহম্ অদসের সেই অংশ যেটা Pcpt-সন-এর মধ্য দিয়ে বহির্জগতের সাক্ষাৎ প্রতাপের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে রূপান্তরিত হয়েছে: এক কথায় এটা হ'ল [অদসের] বাহ্যিক বিভেদের (surface-differentiation) বর্ধিতাংশ। অধিকন্তু, অহমের অন্যতম কাজ হ'ল বহির্জগতের প্রভাবকে অদসের এবং তার প্রবৃত্তিগুলির (tendencies) উপরে উপস্থাপিত করা এবং এর প্রচেষ্টা হচ্ছে যে অদসের একচ্ছত্র অধিপতি সুখসূত্রের পরিবর্তে বাস্তবসূত্রকে প্রতিষ্ঠিত করা। অদসের মধ্যে সেটা সহজাত প্রবৃত্তির উপরেই বিকশিত হয়। অহমের মধ্যে প্রত্যক্ষ-ক্রিয়া সেই কাজ করে। আমরা যাকে বলি যুক্তি এবং প্রকৃতিস্থতা (sanity) অহম্ হ'ল তারই প্রতিনিধি, আর অদস্ হ'ল ঠিক তার বিপরীতধর্মী যার ভেতর [কেবল] অতিরাগ (passions)-গুলো থাকে। এ সবই আমাদের সুপরিচিত জনপ্রিয় বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে পড়ে; এটা কিন্তু, মাত্র গড়পড়তা বা 'আদর্শ' ক্ষেত্রেই কার্যকর।

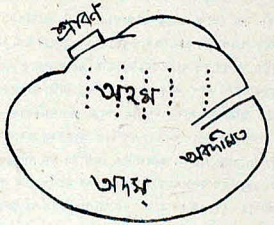

১নং ছবি

এই যে তথ্যটি যে আমাদের কর্মশক্তির প্রচেষ্টাকে অহমই সাধারণতঃ (normally) প্রভাবান্বিত করে এর মধ্য দিয়েই তার কার্মিক গুরুত্ব (functional importance) প্রকট হয়ে ওঠে। তাই অদসের সঙ্গে এর সম্পর্কটা ঠিক ঘোড়ার পিঠে চড়া একজন লোকের মতো, যার কাজ হচ্ছে ঘোড়াটির প্রবলতর ক্ষমতাকে দাবিয়ে রাখা; শুধু পার্থক্য এই যে অশ্বারোহী নিজের শক্তির সাহায্যেই (নিজ বলেই) কাজ করে যে ক্ষেত্রে অহম্ ধার-করা শক্তি ব্যবহার করে। এই উদাহরণটাকে আরও টেনে নিয়ে যাওয়া চলে। যদি কোনও অশ্বারোহীর পক্ষে তার ঘোড়াটার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া না চলে, তবে সে অনেক সময়েই ঘোড়াটা যেদিকে যেতে চায় সেই দিকেই তাকে পথ দেখাতে (guide) বাধ্য হয়; ঠিক সেই ভাবেই অহম্ও সর্বদা অদসের ইচ্ছাকে নিজেরই ইচ্ছা মনে ক'রে সেই মতো কাজ ক'রে যায়।

মনে হয় Pcpt-তন্ত্রের প্রভাব ছাড়াও আরও একটি কারণ (factor) অহমের গঠন-প্রণয়নের এবং অদসের সঙ্গে এর পার্থক্যের জন্য দায়ী আছে। সমস্ত শরীরটি এবং সর্বোপরি শরীরের বহিরাবরণই হ'ল এমন এক জায়গা যেখান থেকে হয়তো বা বাহ্যিক এবং আন্তর এই উভয় প্রত্যক্ষগুলিই উদ্ভূত হয়। এটা অন্যান্য যে কোনও বস্তুরই মতন, কিন্তু একে স্পর্শ করলে দু রকমের সংবেদনের সৃষ্টি করে যার মধ্যে একটা হ'ল আন্তর প্রত্যক্ষের সমকক্ষ। প্রত্যক্ষ-জগতের অন্যান্য সব জিনিসের মধ্যে শরীর যে

কেমন ক'রে তার এই বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে নিয়েছে সে বিষয়টাকে মানসভৌতিক বিদ্যা (psychophysiology) বিশদভাবে (সম্পূর্ণভাবেই) আলোচনা করেছে। ব্যথাও বোধহয় এই ব্যাপারে একটা অংশ গ্রহণ করে, এবং কষ্টকর অসুস্থতার সময়ে আমরা ইন্দ্রিয়াদির বিষয়ে যেভাবে জ্ঞানলাভ করি, আমাদের নিজেদের শরীর সম্বন্ধে একটা ধারণাও সাধারণতঃ বোধহয় সেই ভাবেই ক'রে থাকি।

অহম্ হ'ল প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ শারীর-অহম্ (body-ego) ; এটার যে কেবল একটা বাহ্যিক অস্তিত্বমাত্র রয়েছে তা নয়, এটা সম্পূর্ণরূপেই হ'ল বহিঃস্থলের অভিক্ষেপ (projection)।[১] আমরা যদি এটার একটা অ্যানাটমিক উপমা খুঁজে-পেতে বার করতে চাই তা হলে অনায়াসেই এটাকে অ্যানাটমিবিদ্‌গণের 'cortical homunculus'-এর সঙ্গে অনায়রূপ ক'রে বলতে পারি, যেটা কিনা গুরুমস্তিষ্কের উপর মাথা রেখে বাইরের দিকে পা ছড়িয়ে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে থাকে, এবং আমরা আরও জানি যে এর বাক্‌কেন্দ্র (speech area) আছে বাঁ দিকে।

অহমের সঙ্গে সংজ্ঞানতার সম্পর্ক বিষয়ে বারবার বলা হয়েছে ; তবুও এ প্রসঙ্গে আরও কতকগুলি দরকারী তত্ত্ব থেকে গেছে যেগুলোর ,বর্ণনা প্রয়োজন। আমরা যেখানেই যাই সেখানেই আমাদের সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি সামাজিক এবং নৈতিক মূল্যের মান নিয়ে যেতে অভ্যস্ত বলেই এ কথা শুনে আমরা একটুও আশ্চর্য হই না যে নিম্নস্তরের অতিরাগগুলোর ক্রিয়াক্ষেত্রই হ'ল নির্জ্ঞান মন [স্তর] ; এবং আমরা আরও এটাও আশা করি যে, যে-মানসিক ধর্মটি আমাদের বিচারে যত উচ্চস্তরের সেইটে তত সহজেই তার সুনিশ্চিত-প্রাপ্য সংজ্ঞান-ক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার পাবে। এখানেই কিন্তু, মনঃসমীক্ষণ-লব্ধ অভিজ্ঞতা আমাদের হতাশ করে। একদিকে আমাদের প্রমাণ রয়েছে যে, এমন কি অতি সূক্ষ্ম এবং জটিল বুদ্ধিমত্তার (intellectual) কাজগুলিও, যেগুলির জন্য সাধারণতঃ (ordinarily) প্রচুর সযত্ন একাগ্রতার প্রয়োজন সেগুলিও সময় সময় নির্জ্ঞান মনের মধ্যেই ঠিক সমানভাবেই সুসম্পন্ন হতে পারে, তাদের সংজ্ঞানে আসার দরকারও হয় না। এই ব্যাপারের যে-সব উদাহরণ দেওয়া চলে সেগুলো অখণ্ডনীয় ; যেমন, এ রকম ঘটতে পারে ঘুমের মধ্যে, আর তা বেশ বোঝা যায় যখন কেউ ঘুম থেকে জেগে উঠেই দেখতে পায় যে সে আগের দিন যে-অঙ্কটা কষবার জন্য বা যে-সমস্যাটা সমাধানের জন্য বৃথাই চেষ্টা ক'রে ক'রে হয়রাণ হয়েছিল সেটার সমাধান [উত্তর] সে জেনে গেছে।[২]

আরও একটি ঘটনা আছে, অবশ্য, যেটা আরও অনেক বেশী বিস্ময়কর (stranger)। বহু সমীক্ষণ করতে করতে আমরা আবিষ্কার করেছি যে এমন লোকও আছে যাদের মধ্যে নিজেকে বিচার (criticize) করবার ক্ষমতা এবং বিবেকবোধ—যেগুলো হ'ল খুবই উচ্চস্তরের মানসিক কর্মক্ষমতা—হ'ল একেবারে নির্জ্ঞান এবং এগুলো নির্জ্ঞান থেকেই অতীব প্রয়োজনীয় ফল প্রসব করে ; সমীক্ষণকালে যে-সব নির্জ্ঞাত প্রতিবন্ধের উদাহরণ [সাক্ষ্য] পাওয়া যায় সেগুলোর পক্ষে নির্জ্ঞান স্তরে থাকাটা তা হলে একেবারেই নতুন কিছু (unique) নয়। কিন্তু আমাদের এই নবতম

১ অর্থাৎ, অহম্‌শেষ অবধি শারীরিক সংবেদন-সমূহ থেকেই, বিশেষ ক'রে যেগুলো শরীরের বাইরের অঙ্গ থেকে উৎপন্ন হয় সেইগুলো থেকেই সৃষ্ট [উদ্ভূত]। সুতরাং এটাকে আমরা উপরে যেমন মনোদণ্ডের বহিরঙ্গের প্রতিনিধিরূপে দেখেছি তা ছাড়াও, উপরন্তু, শরীরের বহিরাবরণের মানসিক অভিক্ষেপ-রূপেও ধরা যেতে পারে। ইংরেজী অনুবাদকের প্রামাণ্য টীকা।

২ খুব সম্প্রতি এই রকম একটি ঘটনার কথা আমার কানে এসেছে, এবং এটা নাকি বস্তুতঃ আমার 'স্বপ্ন-ক্রিয়া' ('dream-work') বিবরণের বিরুদ্ধে যাচ্ছে এই রকম অভিযোগও করা হয়েছে।

আবিষ্কার, যা আমাদের সব কিছু বিচারবোধকে (critical faculties) উপেক্ষা করেও এই কথাই আমাদের বলতে বাধ্য করায় যে একটা 'নির্জ্ঞাত অপরাধ বোধ ('unconscious sense of guilt') মানুষের মনে আছে এই আবিষ্কারটি আর সব কিছুর চেয়ে অনেক বেশী ক'রে আমাদের হতবাক্ ক'রে দেয়, আর নতুন নতুন প্রশ্নের সৃষ্টি করে (problem), বিশেষতঃ যখন আমরা ক্রমশঃ দেখতে পাই যে একাধিক বায়ুরোগের মধ্যেই এই নির্জ্ঞাত অপরাধ-বোধ একটা নিশ্চিত মাত্রিক অংশ গ্রহণ ক'রে রয়েছে আর রোগ-মুক্তির পথে একটা অত্যন্ত শক্তিশালী বাধা উপস্থাপিত করছে। এইবার, যদি আমরা আর একবার আমাদের সেই মূল্যের মানের কথায় ফিরে যাই, তবে আমাদের বলতেই হবে যে অহমের মধ্যেকার শুধু যেটুকু নীচতম সেইটুকুই নয়, যেটা মহানতম সেটাও নির্জ্ঞাত থাকতে পারে। এটা যেন এই রকম হ'ল যে আমরা এইমাত্র সংজ্ঞাত অহমের সম্বন্ধে যা জোর গলায় বললাম তারই একটা প্রমাণ পাওয়া গেল : যে এটা হচ্ছে প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ শারীর-অহম্।

ভ্রমবাতুলতা

কনক মজুমদার, এম. এ.

গত সংখ্যায় ভ্রমবাতুলতা রোগ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমেই বলা হয়েছে যে এ রোগ প্রথম অবস্থায় বিশেষজ্ঞ ভিন্ন অন্য কেউ রোগ ব'লে বুঝতে পারে না। এবং বুঝতে পারলেও তার চিকিৎসার প্রশ্ন ওঠে না; কারণ রোগীর কোনও কষ্টবোধ থাকে না, কাজে-কর্মে তার নিজের কোনও অসুবিধা-বোধ থাকে না। রোগীর নিজের দিক থেকে কোনও রকম অসুস্থতা-বোধ বা অসুবিধা-বোধ থাকে না বলিয়া তার কাছে রোগ বা চিকিৎসা কোনও কথাই গ্রহণযোগ্য হয় না। রোগের লক্ষণ হচ্ছে কতকগুলো ভুল ধারণা; সেই বিশেষ ধারণাসমূহ তার কাছে অত্যন্ত সত্য এবং তার দৃষ্টিভঙ্গি সেই সব ব্যাপারে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। তার রোগের ক্ষেত্রে সে অপরের দৃষ্টিভঙ্গি কিছুতেই বুঝতে পারে না এবং নিজের সেই ধারণাসমূহ অত্যন্ত বদ্ধমূল থাকে। যার ফলে অপরের কাছে তার ব্যবহার সমস্যার সৃষ্টি করে।

সব রকম মানসিক রোগের মধ্যে এই শ্রেণীর রোগীদের সম্পূর্ণ আরোগ্য হওয়া খুবই কঠিন। কারণ রোগী নিজের রোগকে রোগ ব'লে স্বীকার করে না এবং চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করে। সমাজে এবং পরিবারে এই রোগ প্রবণতাসম্পন্ন লোকেদের দ্বারাই বেশী অনর্থের সৃষ্টি হয়। অপর পক্ষে সাধারণতঃ এদের মধ্যে কাজের প্রেরণা বেশী দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে অপরের সঙ্গে সংঘাতের ফলে কাজ বাধাপ্রাপ্তই হয় বেশী।

এখানে এক রোগীর বিবরণে দেখা যাবে যে কী ভাবে সে সংসারে অনর্থের সৃষ্টি ক'রে যাচ্ছে, নিজের জীবন এবং পারিবারিক জীবন নষ্ট করতে চলেছে। অথচ তার প্রিয়জনেরা তাকে রোগী ব'লে মনে করে না এবং চিকিৎসা করবার প্রয়োজনও বোধ করে না।

মহিলাটি নিজেই স্বামী মনোনীত করেছেন। কিন্তু বিবাহের ১৫ দিনের মধ্যে এমন ভাবে স্বামীর সঙ্গে সংঘাত হয় যে, সে স্বামীর ঘর থেকে রাগ ক'রে বাপের বাড়ি চ'লে আসে। কিছুতেই নাকি ঐ লোকের সঙ্গে থাকা যায় না। স্বামীর বাড়ি ও বাপের বাড়ি খুব নিকটেই। কৈশোরে উভয়ের মেলামেশা হয়, যৌবনে তা ভালবাসায় পরিণত হয় এবং বিবাহে তা পরিণতি লাভ করে; বিবাহ অনুষ্ঠানের পূর্বে সে সন্তানসম্ভবা হয়। সেই প্রথম সে উপলব্ধি করে কঠিন বাস্তবের বাধা। এর পূর্বে সে যেমন খুশি চলেছে, করেছে, থেকেছে। পড়াশুনা কিছুটা করেছে, কিন্তু কিছুই ধারাবাহিক ভাবে করতে পারে নি কারণ যখনই কোনও অকৃতকার্যতার বাধা এসেছে তখনই সে তা পরিত্যাগ করেছে। সব সময় নিজের খেয়াল খুশি মতো চলেছে; কারও কোনও বাধা মানে নি, কারও কোনও কথা শোনে নি; বিবাহের পূর্বে স্বামীর সঙ্গে মেলামেশায় কারও কথা গ্রাহ্য করে নি। বাবা মা শাসন করতে পারতেন না—করবার চেষ্টা করলেও তা কার্যকর হ'ত না; স্নেহ বশতঃ ক্ষমার চোখেই সব দেখবার

চেষ্টা করতেন, ফলে মেয়ের দুর্বার বেগ বাস্তব উপেক্ষা ক'রে অবাধ স্বাধীনতায় চলবার প্রশ্রয় পেয়েছে। প্রক্ষোভসমূহের যথাযথ ভাবে প্রচয় (development) না হয়ে শিশু অবস্থায় আবদ্ধ থেকেছে। তাই স্বামীর সংসারে এসে প্রথম যখন তাকে বাস্তবের সঙ্গে মানিয়ে অপরের মন মতো চলতে হ'ল তখনই আরম্ভ হ'ল দারুণ বিপর্যয়। বাপের বাড়ির লোকেরা মনে করল বিয়ের আগে তো আমাদের মেয়ে ভালই ছিল, তবে নিশ্চয় শশুরবাড়ির লোকেদেরই দোষ। তারাই মেয়েকে নির্যাতন করছে। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা মেয়েকে স্বামীর ঘরে মানিয়ে-নিয়ে-থাকায় সাহায্য করার পরিবর্তে পরোক্ষে মেয়ের অবাস্তব মনোভাবকেই প্রশ্রয় দিতে লাগল। বহুবার সে থাকবার জন্য স্বামীর বাড়ি গেছে—প্রতিবারই একটা গোলোযোগের সৃষ্টি ক'রে ফিরে এসেছে। স্বামী চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন; কিন্তু সে বাপের বাড়িতে আশ্রয় পেল চিকিৎসার প্রয়োজন নেই ব'লে। বাইরের লোকের সঙ্গে তার ব্যবহার খুবই ভাল—কথাবার্তায় কোনও গোলমাল নেই। খুব উৎসাহী, হাসিখুশী, চঞ্চল; তার স্বাধীনতায় যতক্ষণ না কেউ হস্তক্ষেপ করছে ততক্ষণ সে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কিন্তু কোনও রকম বাধা তার চলার পথে এলেই সে ভীষণ বিক্ষুব্ধ হয়; চিৎকার চেঁচামেচি ক'রে প্রতিবাদ জানায়। বাইরের দিক থেকে বিক্ষোভের কারণ তার কাছে প্রচুর আছে। কিন্তু মূল কারণ হচ্ছে তার শিশুকালীন ব্যর্থতাবোধ, এবং আত্মপ্রীতি। তাকে কেউ কিছু দিতে চায় না, তাকে আটকে রাখতে চায়, তাকে কেউ ভালবাসে না, তাকে জব্দ করতে চায়—স্বামী তাকে ভালবাসেনা, অন্যস্ত্রীলোকে সে আসক্ত—শাশুড়ী তাকে দেখতে পারে না, সে কেবলই নির্যাতিত হচ্ছে ইত্যাদি ধারণা তার বদ্ধমূল হয়ে আছে। এবং তার অভিযোগগুলোর যাথার্থ্য প্রমাণ করবার জন্য সে বহু ঘটনার অবতারনা করে। সে কিছুতেই বুঝতে পারে না যে ঐ সব বদ্ধমূল ধারণার জন্যই সে ঘটনার বা অপরের ব্যবহারের ভুল অর্থ করছে। এই ভাবে সে নিজের সংসার ভাঙতে বসেছে। বাবা মা এটা রোগ ব'লে মনে করছেন না। তাই স্বামীর পক্ষে তার প্রয়োজন মতো চিকিৎসা করানো সম্ভব হচ্ছে না। দুটি সন্তানের সে মা; ছোট মেয়ে দুটি মায়ের কাছে কিছুই বলে না, মাতৃহারা শিশুর মতো বাপের কাছে আছে।

মহিলাটি যতদিন হাসপাতালে ছিলেন সকলের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার খুবই ভাল ছিল। নিজেকে প্রকাশ করবার, প্রশংসা পাবার খুব ঝোঁক ছিল। নিয়মিত ডায়েরী লিখে নিজের মনোভাব প্রকাশ করতেন। তাঁর লেখা ডায়েরীর কিছু অংশ যেখানে তাঁর তীব্র ব্যর্থতাবোধ ফুটে উঠেছে নিম্নে দেওয়া হ'ল। চলে যাবার দিনে তিনি যা লিখে রেখেছিলেন তাতে স্পষ্টই প্রকাশ পাচ্ছে যে তাঁর মনোভাবের কিছুই পরিবর্তন হয় নি; হাসপাতালে থাকার সময় মনোভাব চেপে রেখে কাটিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন মাত্র।

"আজ সাড়ে X মাস পর আবার চলেছি আমার ব্যর্থ জীবনের বোঝা বইতে। কি হলো এখানে এতদিন থেকে? এতটুকুও কি পরিবর্তন হলো আমার জীবন ধারার? তোমরা আমাকে আটকে রেখে কি দিতে পারলে? কলুর বলদের মত শুধু নিষ্করুণ সংসারের ঘানি টেনে যাওয়াই আমার জীবনের একমাত্র পথ। এইতো তোমরা বারবার বোঝাতে চেয়েছ। আমার স্বীকৃতি পেয়েছ বলেই আমাকে তোমরা ছেড়ে দিলে। দেখ, আমি গাড়ি বাড়ি ব্যাঙ্কব্যালেন্স-এর (যে সব তার স্বামীর আছে) কাঙ্গাল নই, আমি স্নেহ মমতা, ভালবাসা আর ঘরের কাঙাল। কৃপনতা

আমার জীবনে সবচেয়ে ঘৃণ্য। কিন্তু অন্তহীন কৃপনতার সঙ্গে আমার জীবন যুদ্ধ। আমার হয়ত চিকিৎসার প্রয়োজন। কিন্তু আমার চেয়ে অনেক বেশী প্রয়োজন ওঁর চিকিৎসার। আমার জীবনের বন্ধন বজ্রবন্ধন। সে বজ্রবন্ধনে আমার অন্তর আত্মা চিৎকার করে কেঁদে বলে 'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোনখানে'। 'ও' এতটুকুও বদলায়নি। বরং ওর বন্ধনের মাত্রা আর একটু বেড়েছে। তোমরা বল বাড়ি থেকে এলে আমি রোগা হোয়ে যাই। নিরন্তর কষাঘাতে মন জর্জ্জরিত হোতে থাকলে মুখে তার ছাপ খানিকটা পড়বে বইকি? তোমাদের অনেক অনেক বিরক্ত করে গিয়েছি। আমি চাই বড় হোতে, মানুষ হোতে, আমার মনের গতি নিম্ন দিকে নয়, উর্দ্ধথেকে উর্দ্ধদিকে। এরকম করে জীবন ধারা চলতে থাকলে একদিন নিশ্চয়ই পাগল হবো। কাজেই মুক্তি একদিন পেতেই হবে।"

* * * *

"বসে বসে ছেলেবেলার কথা ভাবি। ভাবি সেই পুতুল খেলার দিন গুলির কথা। আহা! কি মধুর সে দিন গুলি। আবার যদি পেতাম ফিরে সেই ছেলেবেলা।......পুতুল খেলতাম চমৎকার। সেখানে জিতে গিয়েছি বারবার। কিন্তু আজ আমার সত্যিকারের সংসারে একি পরাজয়।... আমার আপন সংসারে এসে শুধু বাধা নিষেধ শুনতে শুনতে প্রাণ যেন শুকনো কাঠ হয়ে যাচ্ছে।...... মাগো তুমি কি শুনতে পাও আমি তোমায় ডাকি? তোমাকে ডাকলেই চোখে ভরে আসে জল। কেউ কিছু বললে, মনে কোনো আঘাত পেলে তোমার কথাই খালি মনে হয় কেন?......কত দুঃখ কত ব্যাথাই যে তোমাদের দিয়েছি......কত তোমরা বুঝিয়েছ, কত অর্থ ব্যয় করেছ, যখন যা চেয়েছি দিয়েছ,—কিন্তু কিছুই আমি নিতে পারলাম না।...........জানিনা ভাগ্য বিধাতা আজ আমায় কোন পথে নিয়ে চলেছে। কি দুরন্ত প্রাণ দিয়ে গড়েছ বিধাতা তুমি আমায়। এত ঘৃণ্য জীবন, এত দুঃখ, এত আঘাত এত অপমান তুমি আমায় দিয়েছ, তবু আজও আমার বাঁধ ভাঙ্গা প্রাণ বন্যা। যেখানে আমার আজ শুধু কাঁদাই উচিত—সেখানে আমি প্রাণ ভরে হাসি। কোনো দুঃখ যেন আমার প্রাণকে নিঃশেষ করতে পারে না। আমি কি পাষাণ? আমায় এত দিয়েছ ভগবান, কণ্ঠে স্বর দিয়েছ, লেখাপড়া করার মত মাথাও দিয়েছিলে, নাচবার মত দেহ দিয়েছিলে, বাজাবার মত অঙ্গুলি দিয়েছিলে—কিন্তু যা দাওনি, তা যত্ন আর ধৈর্য্য। এতর মধ্যে যদি একটি গুণ আর তার সাথে ধৈর্য্য আর যত্ন দিতে ঠাকুর, তাহলে আমার জীবনটা আজ এমন করে ব্যর্থ হয়ে যেতোনা। সব দিকে আমায় এমনি করে মেরে তুমি কি আনন্দ পেলে?..... ভালবাসার সঙ্গে জড়ান থাকে মস্ত বড় লোভ, মস্ত স্বার্থের কামনা, তাই তার সঙ্গে থাকে দুঃখ যন্ত্রনা, নিরাশা, অসম্মান, নির্দ্দয় নিন্দায় আর কুৎসিৎ ক্লেদে প্রাণের ক্ষেত্র ভরে ওঠে, তারপর একদিন অশ্রুর বন্যায় তার প্রায়শ্চিত্ত শেষ হয়।..........আজ ভোর রাত্রে ভীষণ খারাপ স্বপ্ন দেখেছি। উঃ ঘুমের মধ্যেও মনের মধ্যে কি অসহ্য যন্ত্রণা। মনকে যতই বোঝাই ও তো স্বপ্ন, সত্যি নয়, তবু খালি মনে হয়, এমন স্বপ্ন কেন দেখলাম? আর দেখলাম ত ভুলে কেন গেলাম না? কেন এত পরিষ্কার ভাবে কথাটা মনে থাকলো। আজ সারাদিন যতবার স্বপ্নের কথা মনে হোয়েছে, ততবারই তীর বেঁধা পাখীর মত ছটফট করেছি। স্বপ্নটা হল, 'ও' যেন আবার বিয়ে করেছে একটি বিবাহিতা এবং সন্তানের মা এমন একটি মহিলাকে।......দেখছি ও যেন ওর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর জন্য আলাদা বাড়ী করেছে, চমৎকার সব ফার্নিচার দিয়ে বাড়ীটা সাজিয়েছে, বাড়ীটাও চমৎকার। সে ভদ্রমহিলা

আমার সাথে খুব ভাল ব্যবহার করলো কিন্তু আমি কিছুতেই ভাল ব্যবহার করতে পারলাম না ওর সাথে। উঃ কি যন্ত্রণা। ওকে বিশ্বাস করেই ত বেঁচে আছি; ও যদি কখনও তা বাস্তবে করে তবে কি সহ্য করতে পারবো?......"

"কেন? এই আকড়ে ধরার প্রবৃত্তি, কেন? কেন? আকড়ে ধরবো নাই বা কেন? এ আকড়ে ধরার প্রবৃত্তি ত আমরা পৃথিবীর কাছে পেয়েছি, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির মত আমাদের সংসারী মনটাও শুধু আকড়ে ধরতেই চায়। আকড়ে ধরার প্রবৃত্তি আছে বলেই তো আমরা সংসারি, না হলে তো বিবাগী হোয়ে ঝোলা কাঁধে করে বেরিয়ে পড়লেই হয়। যদি ঘর সংসার স্বামী সবাইকে আকড়েই না ধরবো তবে এত ঘটা করে লুম্বিণী পার্কে আসা কেন? মানুষ ছাড়তে তখনই পারে যখন সে পরিপূর্ণ ভাবে পায়। কিছুই যার নেই, সে ছাড়বে কি? আমরা যখন সংসার ছেড়ে বাইরে কোথাও থাকি তখন মনটা উদার, উন্মুক্ত আকাশের মত উদার হোয়ে যায়, অথচ দৈনান্দিন ঘর সংসারে আমরা কত ছোট মনের পরিচয় কত সময় দিই। কেন এমন হয়? কারণ সংসার মানেই সংঘাত, 'সংসার সমরাঙ্গণে যুদ্ধ কর প্রাণপণে'—এই সংঘাতের ফলে মনের পরিসর আস্তে আস্তে ছোট হোতে থাকে। সংসার করতে গিয়ে আমরা আমাদের গণ্ডীকে সংকীর্ণ ক'রে আনি। সংকীর্ণ আমি নিজে থেকে করছিনা। পরিজনের ব্যবহার এই সংকীর্ণতার মূলে। পরিজনের ব্যবহার যদি উদার হয় তবে আমার ব্যবহারটাও উদার হোতে বাধ্য। কিন্তু আত্মীয় স্বজনের সংকীর্ণতা আমাদেরকেও সংকীর্ণ করে তোলে। কৃপণ স্বভাবের বাড়ীর সঙ্গে থাকতে থাকতে আমার মনটা আস্তে আস্তে কৃপণ হয়ে উঠছিল। কিন্তু আমি জাত কৃপণ নই, তাই মনের আবিলতাও জমেছিল প্রচুর"...........'লাভ ক্ষতি, টানাটানি অতি সূক্ষ্ম ভগ্ন অংশ ভাগ, কলহ সংশয়' এ ছাড়া পথও নেই। সংসারে থাকতে গেলে এগুলো থাকবেই, থাকবেই নয়, এগুলো আসবেই। 'লাভ ক্ষতি টানাটানির মাঝে মন হাঁপিয়ে ওঠে, সংকীর্ণতার চার দেওয়ালে মাথা ঠোকাই সার—রুদ্ধ দুয়ারের অর্গল হচ্ছে দুই কন্যা আর স্বামী। এই অর্গল খুলে বাইরে যাওয়া আমার দুঃসাধ্য। থাক রুদ্ধ দুয়ার যদি খোলা থাকে বাতায়ন।" ইত্যাদি...........

লুম্বিনি সম্বন্ধে—

এই পত্রিকার গত সংখ্যায় আমরা আয়ুর্বেদীয় ঔষধ মানসিক রোগে প্রয়োগ করা সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছিলাম। বাজারে এলোপ্যাথি ঔষধ বহু রকমের বাহির হইতেছে। তাহার মধ্যে কতকগুলির উপকারিতা সম্বন্ধে অনেকদিন ব্যবহার করিয়া জানা গিয়াছে। কিন্তু অধিকাংশগুলিই বিজ্ঞাপনের জোরে কিছুদিন চলে, তাহার পর আস্তে আস্তে তেমন সুফল না পাওয়ায়, অনাদৃত হইয়া প্রায় লোপ পায়। বিদেশ হইতে নূতন ঔষধ কিছু আসিলেই তাহা বিজ্ঞাপনের জোরে বেশ কিছুদিন বাজার গরম করিয়া তুলে। আমাদেরও সেইগুলি অন্ততঃ কিছু পরিমাণে ব্যবহার করিয়া দেখিতে হয়। এইভাবে পরীক্ষা করিতে করিতে কত ঔষধ যে বাদ দিতে হইয়াছে তাহা বলা কঠিন। যেগুলিতে সুফল পাওয়া যায় সেগুলিরও নানা কারণে সবগুলি সকল সময় পাওয়া যায় না বা সামান্য কিছু পাইলেও ব্যবসায়ীর মুনাফার অংশ এত বাড়িয়া যায় যে সেই সকল ঔষধ জনসাধারণের পক্ষে কিনিয়া চিকিৎসা করানো প্রায় অসাধ্য হইয়া পড়ে। মানসিক রোগের চিকিৎসা দীর্ঘদিন ধরিয়া করিতে হয়। এজন্যও খরচ বেশী হয়। এইসব বহু কারণে আয়ুর্বেদীয় ঔষধ ব্যবহার করিয়া দেখা অত্যন্ত প্রয়োজন। বহুদিন উপযুক্ত চর্চা ও অনুশীলন না থাকার ফলে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা বাংলা দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বেশীর ভাগ লোকের নিকট নিন্দিত ও বিদ্রূপের বিষয় হইয়া আছে। বলা বাহুল্য ইহা বৈজ্ঞানিক বিচারের ফল নহে। আমরা শিক্ষিত বা অশিক্ষিত সকলেই কমবেশী বিজ্ঞাপনের দ্বারা প্রভাবান্বিত। আয়ুর্বেদের বিজ্ঞাপন আমরা অধিকাংশ লোকই পড়িয়াও দেখি না। বিদেশী শিক্ষা ও শাসনের ফলে আমাদের মনোবৃত্তিও সেই বিদেশের প্রতি চাহিয়া থাকিবার দিকে ঝুঁকিয়াছে। স্বাধীনতা লাভের পরে এই কয় বছরের মধ্যেও আমরা নিজের দেশের জ্ঞানবিজ্ঞানের দিকে কতটা তাকাইতে পারিয়াছি সে সম্বন্ধে সুধীগণকে ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। চর্চা না থাকিলে যে কোনও বিদ্যাই, অন্ততঃ সাময়িক ভাবে, গতিহীন হইয়া স্তিমিত হইয়া যায়। আয়ুর্বেদেরও সেই অকাল জরাগ্রস্ত হইতে হইয়াছে। আয়ুর্বেদের সব ভাল বা সব মন্দ এমন কথা বলা চলে না। বৈজ্ঞানিক প্রথায় বিচার করিয়া যাহা গ্রহণীয় তাহা গ্রহণ করা, যাহা পরিবর্তিত করার যোগ্য তাহার আবশ্যক পরিবর্তন সাধন করিয়া এবং যাহা বর্জনীয় তাহা বর্জন করিয়া এই উপেক্ষিত চিকিৎসা-প্রণালীর পুনঃ প্রবর্তন একান্ত আবশ্যক বলিয়া আমরা মনে করি।

ভারতের কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী ডাঃ করমরকার এদিকে দৃষ্টি দিয়া আমাদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। তাঁহার চেষ্টা ঠিক পথে চালিত হইলে এই আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার আবার প্রাণসঞ্চার হইবে বলিয়া আমরা মনে করি। এ চেষ্টার সফলতা আমরা কামনা করি। লুম্বিনির কর্মসমিতি কয়েক বছর পূর্বেই মানসিক রোগে আয়ুর্বেদীয় ঔষধ ব্যবহার ও ঐ প্রণালীতে মানসিক রোগ চিকিৎসা করার মত গ্রহণ করিয়াছিল। এজন্য যে পৃথক্ বিভাগ থাকা দরকার, অর্থাভাবে আমরা আজও তাহা গড়িয়াতুলিতে পারি নাই। এ সম্বন্ধে গবেষণা করিবার মতো যোগ্য লোকও আমরা পাইয়াছি। একই অর্থাভাবে তাঁহার সাহায্যও আমরা গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। ইহা খুবই দুঃখের বিষয় হইলেও সত্য যে আমাদের ভারতীয়দের জীবনের বেগ ও নিষ্ঠা কম। তবু সামান্য হইলেও আরম্ভ না করিতে পারিলে ভবিষ্যত গড়িয়া তোলা সম্ভব হইবে না। এই জন্য আমরা সহৃদয় পাঠকপাঠিকা ও জনসেবাধর্মী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলিকে আমাদের সাহায্য করিতে

অনুরোধ জানাইতেছি। কোনও সাহায্যই সামান্য নহে। 'বিন্দু হইতেই সিন্ধু হয়'। আমরাও ইহা বিশ্বাস করি।

প্রায় একুশ বৎসর লুম্বিনিতে মানসিক রোগীর সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের পারিবারিক নানা অবস্থা সম্বন্ধে অনেক বিষয় আমরা জানিতে পারিয়াছি। বিশেষ করিয়া পরিবারে একটি মানসিক রোগী থাকিলে সে পরিবারের অন্য সকল লোকের সুখ শান্তি যে কী পরিমাণে লোপ পায় এবং অল্প বয়স্কদের মনের উপর এই সব রোগীর উক্তি, ব্যবহার ইত্যাদি কত যে অনিষ্টকর হয় তাহাও জানিয়াছি, দেখিয়াছি। চিকিৎসা করিলেও সব মানসিক রোগীকে আজও আরোগ্য করিতে পারা যায় না। এই সব রোগীদের হাসপাতাল হইতে আবার নিজ নিজ পরিবারে ফেরত পাঠাইলে সেই সব পরিবারের লোকেরা এবং এই সব রোগীদের অবস্থা কিরূপ হয় তাহা সহজেই অনুমান করা চলে। সমাজের এই সমস্যা আদৌ হেলায় অগ্রাহ্য করিবার মতো নহে। সমাজদেহে এই দুষ্ট ব্রণ যে অনিষ্ট করিতেছে তাহা বুঝিয়া দেখিবার এবং প্রতিকার করিবার চেষ্টা সরকারের তরফ হইতে আজও দেখা যায় নাই। পীড়িতের সেবার জন্য অনেক প্রতিষ্ঠান দেশে কাজ করিতেছে কিন্তু এই দুরারোগ্য মানসিক রোগীর কল্যাণের দিকে আজও তেমন দৃষ্টি পড়ে নাই। পাগল আজও অধিকাংশের কাছেই উপেক্ষা পাইতেছে। উন্নত পাশ্চাত্ত্য দেশগুলিতে যক্ষা ইত্যাদি নানা জীবন-নাশক রোগ চিকিৎসার উন্নতির ফলে আয়ত্তের মধ্যে আনা হইয়াছে। কিন্তু মানসিক রোগ ক্রমে দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে। এই রোগীদের মধ্যে দুরারোগ্য রোগীর সংখ্যাও বাড়িতেছে। আমাদের দেশেও তাহাই হইতেছে। এ দেশে সুস্থ ও পীড়িতের প্রতি সহানুভূতিশীল সহৃদয় ব্যক্তির অভাব আছে এমন কথা আমরা মনে করি না। মানসিক রোগীর এই সমস্যার দিকটা লোকচক্ষে উপযুক্ত ভাবে আজও তুলিয়া ধরা হয় নাই। আমাদের সাধ্যমতো আমরা সে চেষ্টা করিতেছি। আশা রাখি অদূর ভবিষ্যতে সুফল দেখা দিবে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে দুরারোগ্য মানসিক রোগীদের পরিবার হইতে সরাইয়া রাখিবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠানেরও পরিকল্পনা লুম্বিনির কর্মসমিতি কয়েক বছর আগেই গ্রহণ করিয়াছে। এ জন্য বীরভূমের মধ্যে বোলপুরের নিকট বিস্তৃত সমতল স্থান এই রকম প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উপযুক্ত মনে করিয়া ঠিক করা হইয়াছে। সেই জমি কিনিয়া বাড়ি ইন্দারা ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতে প্রাথমিক প্রায় দুই লক্ষ টাকার দরকার। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ঐ অঞ্চলে খাস জমি হইতে এই কাজের জন্য আমাদিগকে জমি দিতে আমরা গত দুই বৎসর হইতে অনুরোধ জানাইয়া আসিয়েছি। আজও কোনও সুরাহা হয় নাই। আমাদের হাতে এ কাজ আরম্ভ করিবার উপযুক্ত লোক আছে, কিন্তু টাকা নাই। সরকারের নিকট আবেদন যথারীতি করা হইতেছে। কবে তাহা মঞ্জুর হইবে জানি না। আমরা এ জন্য দেশবাসীর নিকট আমাদের প্রস্তাব উপস্থাপিত করিতেছি। লুম্বিনি এই একুশ বৎসরের জীবনে মূলতঃ দেশবাসীর সহায়তা, সাহায্য ও সহানুভূতি পাইয়া বড় হইয়া উঠিতেছে। এক্ষণে আবার আমরা দেশবাসীর সম্মুখেই এই সমস্যা ও তাহার প্রতিকারের উপায় অতি সংক্ষেপে তুলিয়া ধরিলাম। তাঁহাদের সাহায্যই প্রধানতঃ আমরা আশা করি।

ইংরেজী ১৯৬১ সালের মার্চ মাসে ভারতীয় মনঃসমীক্ষা সমিতির বাৎসরিক অধিবেশনে যে সভ্যগণ দ্বারা লুম্বিনির নূতন কার্যসমিতি গঠিত হইয়াছে নিম্নে তাঁহাদের নাম দেওয়া হইল। এই সমিতি আগামী মার্চ ১৯৬২ পর্যন্ত কার্য করিবে।

ডাঃ সুহৃৎচন্দ্র মিত্র, এম.এ., পি.এইচ. ডি. (সভাপতি)
ডাঃ তরুণচন্দ্র সিংহ, ডি. এস্‌সি. (সচিব)
ডাঃ নগেন্দ্রনাথ দে, এম.বি., এম. আর. সি.পি., ডি.পি.এম.
ডাঃ নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, এম.এস্‌সি., এম.বি.
শ্রীমতী সুষমা দাসগুপ্তা, বি.এ.
ডাঃ বিজয়কেতু বোস, বি.এসসি., এম.বি., বি.এস.
শ্রীসত্যপ্রসন্ন সেন, এম.এস্‌সি.
শ্রীবিমলকুমার ঘোষ, সলিসিটার
শ্রীনদিয়া বিহারী অধিকারী, বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্‌-এর ম্যানেজার
ডাঃ জগবন্ধু মুখোপাধ্যায়, এম.বি., ডি:পি.এম. (পঃ বঃ সরকারের প্রতিনিধি)
ডাঃ জে. আর. চট্টোপাধ্যায়, এম.বি., এম.আর.সি.পি.
(ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি)
শ্রীমতী সতী সিংহ, (প্রতিনিধি, নিখিল ভারত নারী সম্মিলনী, কলিকাতা শাখা)
শ্রী কে. এন. মুখোপাধ্যায়, (ইণ্ডিয়ান রেডক্রস সোসাইটির প্রতিনিধি)
ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র দাশগুপ্ত, এম.এ., পি.এইচ. ডি.
শ্রীশৈলেশচন্দ্র সেন (এড্‌ভোকেট)
... ...(কলিকাতা পৌরসভার একজন প্রতিনিধি)*

১৯৬১ সালের জানুআরি মাস হইতে মার্চ মাস পর্যন্ত লুম্বিনির কার্যবিষয়ক বিশেষ জ্ঞাতব্য তথ্যগুলি নিম্নে দেওয়া হইল।

১৯৬১ ইং সন

বেড সংখ্যা—১৩৫

রোগী ভর্তি ও নির্গম

	ভর্তি	নির্গম
জানুআরি	৩৬	৩৬
ফেব্রুআরি	৩৪	২৮
মার্চ	৪৩	৪৭

চিকিৎসার ফলাফল

	আরোগ্য	উন্নতি	অপরিবর্তিত	মোট
জানুআরি	১৫	২০	১	৩৬
ফেব্রুআরি	১৪	১২	২	২৮
মার্চ	২১	২৩	৩	৪৭

* এখনও নাম পাওয়া যায় নাই।

বহির্বিভাগে মানসিক রোগী

	নূতন	পুরাতন	মোট
জানুআরি	৬১	২৮২	৩৪৩
ফেব্রুআরি	৬২	২৮৪	৩৪৬
মার্চ	৬০	২২০	২৮০

আয়-ব্যয় হিসাব

	মোট আয়	মোট ব্যয়
জানুআরি*	৩৫,১২৫'৫৬	২৪,৮৬৫'৮১
ফেব্রুআরি	২২,০৫৩'৩২	২৪,৬৭৭'৮৩
মার্চ	৪২,১২৬'৪৩	২৫,৮২০'৮৩

* এই টাকার মধ্যে ১০,০০০৲ (দশ হাজার টাকা) ব্যয় নির্বাহের জন্য খরচ করা হইয়াছে।

—তরুণচন্দ্র সিংহ

কার্ল গুস্তভ্ ইয়ুং

(১৮৭৫—১৯৬১)

এই সংখ্যার ছাপা-কাজ আরম্ভ হওয়ার পর ৬ই জুন তারিখে কার্ল গুস্তভ ইয়ুং-এর মৃত্যু সংবাদ পাওয়া যায়। অল্প সময় ও পরিসরের মধ্যে এই শক্তিমান মনোবিদের দীর্ঘজীবনের অবদান সম্বন্ধে সমালোচনা করা সম্ভব নহে। তাই তাঁহার মতবাদের মূল তত্ত্বগুলির এখানে সংক্ষিপ্ত উল্লেখ মাত্র করিয়া আমাদের শ্রদ্ধা জানাইতেছি। তাঁহার মতবাদ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা আমরা পরের সংখ্যায় প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ বিজ্ঞান প্রচারিত হওয়ার প্রথম পর্যায়ে যে সকল মনোবিদ্‌গণ তাঁহার নব প্রতিষ্ঠিত মতবাদে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার সান্নিধ্যে আসেন তাহার মধ্যে আড্‌লার ও ইয়ুং-এর নাম বিশেষ কারণে উল্লেখযোগ্য। আড্‌লার অপেক্ষা ইয়ুং নিজ প্রতিভাবলে অধিক সম্মানিত স্থান অধিকার করেন।

১৮৭৫ সালে তাঁহার জন্ম হয়। সুইজারল্যাণ্ডে জুরিক্ শহরে তিনি ব্লয়লারের সহকর্মী হিসাবে তখন কার্যে রত। চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া ক্রমে মানসিক রোগীর চিকিৎসার প্রতি আকৃষ্ট হন। এই সময় ফ্রয়েডের যুগান্তরকারী আবিষ্কারের কথা জানিতে পারেন। ক্রমে ফ্রয়েডের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। ইয়ুং-এর বুদ্ধিদীপ্ত কর্মনিষ্ঠ প্রতিভার প্রতি ফ্রয়েড আকৃষ্ট হন। দুইজনে সহযোগে মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতির নানা তথ্য ও তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ইয়ুং-এর ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া, ফ্রয়েড তাঁহাদের উভয়ের চেষ্টায় ১৯১১ সালে নব-প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক মনঃসমীক্ষা সমিতির প্রথম সভাপতি হিসাবে ইয়ুংকে নির্বাচিত করেন। কিন্তু ১৯১৩ সাল পার হওয়ার পূর্বেই দেখা গেল ইয়ুং ফ্রয়েড প্রবর্তিত মনঃসমীক্ষার মূল তত্ত্ব হইতে ক্রমেই সরিয়া যাইতেছেন। শেষপর্যন্ত ইয়ুং ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতি ত্যাগ করিয়া নিজেকে "বৈশ্লেষিক মনোবিদ্" (analytical psychologist) বলিয়া প্রচার করিলেন। তাঁহার এই পরিবর্তিত মতবাদকে তিনি "বৈশ্লেষিক মনোবিদ্যা" (analytical psychology) নাম দিলেন।

ফ্রয়েড মানুষের নির্জ্ঞান মনের মূল শক্তির মধ্যে কাম (libido) এবং আক্রম (aggression) প্রবৃত্তিকে প্রধান বলিয়া মানিয়াছেন। ইয়ুং এই "লিবিডো" কেবল মাত্র কামশক্তিমূলক বলিয়া স্বীকার না করিয়া ইহাকে আরও বিস্তৃত করিয়া শোপেনহয়ারের জিজীবিষা (will to live) বা বার্গসঁর মূলজীবন-শক্তি (elan vital) মতবাদের সমপর্যায় ভুক্ত করিয়া প্রচার করিলেন। তাঁহার মতে শিশুর সুখবোধ প্রধানতঃ তাহার আহার ও বাড়িয়া-ওঠার সঙ্গে যুক্ত এবং ইহার সহিত কামজ সুখের মিল নাই, কারণ শিশুর জীবন গতিবেগে তখনও কাম দেখা দেয় নাই। ফ্রয়েড যে অর্থে শিশুর কামপ্রবৃত্তির প্রকাশ দেখিয়াছেন ইয়ুং তাহা মানিলেন না। পরে ফ্রয়েড মনের সহজাত প্রবৃত্তিকে দুই ভাগে ভাগ করিয়া জীবনেষণা (eros), মুখ্যতঃ জীবন ভোগ ও বাঁচিয়া থাকার ইচ্ছা, এবং মরণেষণা, নিজের মরিবার ও অপরকে মারিবার ইচ্ছা মানিয়াছেন। এই জীবনেষণার সহিত ইয়ুং-প্রবর্তিত জীবনশক্তির কিছুটা মিল আছে।

মানুষের নির্জ্ঞান মনে এক শ্রেণীর কতকগুলি আবেগ একত্র মিলিত হইয়া একটা জটিল গুঢ়ৈষা (complex) সৃষ্টি করে প্রথম ইয়ুং এ তথ্য আবিষ্কার করেন। ফ্রয়েড নির্জ্ঞান মনের ইডিপস গুঢ়ৈষার

(Oedipus complex) অপরিণত অবস্থাই উন্মাদ রোগের কারণ মনে করেন। ইয়ুং এই মত মানিতে পারেন নাই। তাঁহার মতে ঐ ইডিপস গুঢ়ৈষা একটা প্রাথমিক পরিবেশ মাত্র। ব্যক্তির জীবনের বর্তমান পরিস্থিতির কোনও সমস্যা সমাধানে যে পরিমাণ মানসিক শক্তির প্রয়োগ প্রয়োজন তাহা করিতে না পারিলে, মনের গতি শৈশবের প্রাথমিক ভক্তি অনুসারে সে-সমস্যার সমাধান খুঁজিতে গিয়া শিশু যে-ভাবে তাহার ইডিপস গুঢ়ৈষার মীমাংসা করিতে না পারিয়া কল্পনার আশ্রয় লইয়াছিল, পুনরায় সে ঐ কাল্পনিক ভ্রান্ত পরিবেশ সৃষ্টি করার ফলে বাস্তব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া রোগের কবলে পড়ে। তাহার মনের এই শৈশব বিচার-ভক্তির পরিবর্তন করিতে পারিলেই রোগ সারিয়া যায়। ফ্রয়েডের সঙ্গে এ বিষয়ে তাঁহার মতের কিছু বিরোধ থাকিলেও তাহা প্রধানতঃ দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের বিরোধ। ইয়ুং বলেন বর্ত্তমানের সমস্যা মিটাইয়া দিতে পারিলেই রোগ সারিয়া যায়।

এরস্ ও থানাটস্ (Eros or life instinct এবং Thanatos or death instinct) নাম দুইটি গ্রীক দেশীয় পুরাণ কাহিনী হইতে নেওয়া হইয়াছে। অল্প ভাল বাংলা প্রতিশব্দ আজও গৃহীত না হওয়ায় আমরা এই প্রবন্ধে যথাতি উপাখ্যান হইতে নাম লইয়া এরস্‌কে যথাতিবৃত্তি ও দধীচি উপাখ্যান হইতে নাম লইয়া থানাটকে দধীচিবৃত্তি বলিয়া উল্লেখ করিলাম। পূর্ববর্ণিত ফ্রয়েডীয় যথাতিবৃত্তি ও দধীচিবৃত্তি ইয়ুং না মানিলেও, তিনিও অনেকগুলি পরস্পর-বিরোধী মনের শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

তাঁহার আবিষ্কারের মধ্যে অন্তর্বৃত্তি (introversion) ও বহির্বৃত্তি (extroversion) এই দুইটি মূল মানসিক প্রকৃতি অনুসারে সমগ্র মানবকে ভাগ করিবার প্রথা বর্তমানে নানা ক্ষেত্রে স্থান পাইয়াছে। দৈনন্দিন জীবনে আমরা ইহার বহু প্রয়োগ দেখিতে, শুনিতে পাই। ইয়ুং-এর মতে যে মানুষ প্রকাশতঃ অন্তর্বৃত্তি নির্জ্ঞানে সে বহির্বৃত্ত এবং যে মানুষ বাহ্যিকজীবনে বহির্বৃত্ত, নির্জ্ঞানে সে অন্তর্বৃত্ত। অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষের মানস জীবনেই এই অন্তর্বৃত্তি ও বহির্বৃত্তির অস্তিত্ব আছে। কেবল তাহাই নহে। এই দুইয়ের মিশ্রণেও নানা প্রকারের স্বভাব দেখা যায়। মানুষের এই বিভিন্ন মনের গঠন হইতেই তাহাদের জীবনের গতি বিভিন্নমুখী হয়। তাঁহার মতে প্রধানতঃ চার শ্রেণীতে মানসিক ক্রিয়াগুলি ভাগ করা চলে যথা :—চিন্তা (thinking), প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়জ্ঞান (sense perception), স্বজ্ঞা (intuition) ও অনুভূতি (feeling)। মানুষের এই সকল প্রকৃতি বিভাগের ফলে মানুষকে বুঝিবার সুবিধা হইয়াছে বলিয়া ইয়ুং মনে করেন। ফ্রয়েড মনঃসমীক্ষার জন্য রোগীর মনের অবাধ ভাবানুষঙ্গ (free association ইহতে তাহার নির্জ্ঞান মনের পরিচয় পাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইয়ুং দেখাইলেন শব্দানুবাদী অভীক্ষা (word association test) দ্বারা মনের গূঢ়ৈষা জানিতে পারা যায়। ইহাও তাঁহার একটি মূল্যবান আবিষ্কার।

নির্জ্ঞান মন সম্বন্ধে ইয়ুং বহু কাজ করিয়াছেন। তাঁহার মতে নির্জ্ঞান মনে দুইটি স্তর আছে। এক স্তরে ব্যক্তির নিজের জীবনের অবদমিত কামনা-বাসনা স্থান পায়। ইহাকে ব্যক্তি-নির্জ্ঞান (individual unconscious) বলা হয়। অপরটিকে তিনি গোষ্ঠী-নির্জ্ঞান (collective unconscious) নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই গভীরতর স্তরে মানুষের আদিম যুগ হইতে মনের আদিমতম প্রবৃত্তিগুলি বংশানুক্রমে আমাদের মধ্যে চলিয়া আসিতেছে। তিনি মনে করেন মানসিক রোগ-লক্ষণে, স্বপ্নে, রূপকথায় প্রভৃতি নানা ক্ষেত্রে সেই আদিম প্রকৃতির কর্ম ও চিন্তা পদ্ধতি প্রকাশ পায়। এই গোষ্ঠী-নির্জ্ঞানের মধ্যে আদিম সহজ প্রবৃত্তি (instinct) অর্থাৎ আদি কর্মপ্রকরণ যেমন আছে, তেমনই আছে আদিরূপ (arche-type) বা আদি চিন্তাপ্রকরণ। এই আদিরূপ যখন নির্জ্ঞান হইতে

সংজ্ঞানে আসে তখন তাহা হয় ভাব (idea)। এই আদিরূপ আমাদের পরিণত মনে রূপকথা, স্বপ্ন ইত্যাদির মাধ্যমে অতীন্দ্রিয় (mystic)-বোধ জাগায়। ফ্রয়েড-প্রস্তাবিত অদস্ (id) হইতে ইয়ুং-এর এই গোষ্ঠী-নির্জ্ঞান কিছুটা পৃথক। ইয়ুং মনে করেন মানুষের সংজ্ঞান মনে যাহা প্রকাশ পায় নির্জ্ঞানে তাহার অপর প্রবৃত্তিগুলি ঢাকা থাকে। অর্থাৎ প্রত্যেকের নির্জ্ঞান ও সংজ্ঞান মিলিত মন যেন সকলের প্রায় একই। পার্থক্য কেবল ঐ প্রকাশ আর অপ্রকাশের বিভিন্নতায়। রোগ সারাইতে হইলে রোগীর ব্যক্তি-নির্জ্ঞান চিন্তা ও ইচ্ছাগুলিকে প্রথমতঃ সংজ্ঞানে আনিয়া পরে তাহার গোষ্ঠীনির্জ্ঞানের ইচ্ছা ও চিন্তাগুলিকে প্রকাশ্যে আনিতে হইবে। পুরুষ রোগীর নির্জ্ঞানের "চিরন্তন নারীত্বকে" (eternal feminine) এবং স্ত্রীরোগীর নির্জ্ঞানের চিরন্তন পুরুষত্বকে (eternal masculine) সংজ্ঞানে আনিয়া দিয়া সে সম্বন্ধে তাহার বোধ ও অনুভূতি জন্মাইয়া দেওয়া দরকার।

স্বপ্ন সম্বন্ধেও ইয়ুং-এর মত ফ্রয়েড হইতে কিছু পৃথক। ফ্রয়েড মনে করেন, স্বপ্নে আমরা অবদমিত ইচ্ছা পূরণ করি এবং এই ইচ্ছা আমাদের বৈশব-ইচ্ছার সঙ্গে প্রায়শঃ যুক্ত থাকে। কিন্তু ইয়ুং বলেন, স্বপ্ন আমাদের বর্তমান সমস্যা সমাধানের জন্য নির্জ্ঞানের চেষ্টার ফল। কেবল তাহাই নহে নির্জ্ঞান মনের গঠনমূলক আন্দোলনের নির্দেশক, যাহা জীবনের ভবিষ্যতের দিকেও ইঙ্গিত করে।

চিত্তভ্রংশী বাতুলতা (dementia præcox) সম্বন্ধে তাঁহার গভীর গবেষণার বইখানি মনোবিজ্ঞার জগতে তাঁহাকে সুপরিচিত করিয়া দেয়। তাহার পর তিনি সারাজীবন মনোবিজ্ঞার, বিশেষ করিয়া নির্জ্ঞান মন সম্বন্ধে, নানা তথ্য সংগ্রহ করিতে তৎপর ছিলেন। তাঁহার গোষ্ঠীনির্জ্ঞানবাদ তাঁহাকে ক্রমে নানাদেশের পৌরাণিক কাহিনী ও রূপকথার, এমন কি কিছুটা, ঈশ্বর ও ধর্মানুভূতির আলোচনার দিকে টানিয়া লয়। এ বিষয়ে তাঁহার যথেষ্ট পড়াশুনা ও পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি এক চিরন্তন মাতৃকল্পনাও করিয়াছেন এবং তাঁহার মতে ঈশ্বর মানুষের জীবনের সকল শক্তির (লিবিডোর) সমষ্টি বলিয়া মনে করেন।

এই সব আলোচনার মধ্যে তিনি নিজেকে এমন ভাবে জড়াইয়া ফেলেন যে পরের দিকে তিনি নির্জ্ঞান মনের বিভিন্ন তত্ত্ব আবিষ্কারের চেষ্টায় ক্রমে বিজ্ঞানের সুস্পষ্ট নির্দিষ্ট পন্থা ছাড়িয়া যে অতীন্দ্রিয়-বাদের দিকে চলিয়াছিলেন, পরবর্তীকালের তাঁহার লেখা হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রকৃত বৈজ্ঞানিক মনোবিদ্ এই অতীন্দ্রিয়তা আদৌ স্বীকার করিবেন কিনা বা স্বীকার করিলেও কী পরিমাণে তাহা মানিয়া লইবেন ও তাহার পরিবর্তিত বৈজ্ঞানিক রূপ কী হইবে আজ সে কথা বলা কঠিন। তাঁহার মতবাদ মানা বা না মানার প্রশ্ন বাদ দিয়াও ইয়ুং-এর মনোবিজ্ঞার প্রতি গভীর অনুরাগ, সেজন্য তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং তাঁহার আবিষ্কৃত মনের নানা তথ্যাদি যে মনোবিজ্ঞানকে বহু পরিমাণে পুষ্ট ও সমৃদ্ধ করিয়াছে এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন। তাঁহার মৃত্যুতে শোক করিয়া লাভ নাই। সুদীর্ঘ জীবনে তিনি যাহা দিয়া গেলেন সেই দানের প্রকৃত বৈজ্ঞানিক মূল্য নির্ধারণের দায়িত্ব বর্তমানে জীবিত এবং ভবিষ্যতের মনোবিদ্‌গণের উপর আসিয়া পড়িল। মানবসমাজ তাঁহার নিকট হইতে কী পাইল, সত্যান্বেষী বৈজ্ঞানিক তাহার উত্তর দিবেন।

—তরুণচন্দ্র সিংহ

Statement about ownership and other particulars about newspaper (**Chitta**) *to be published in the first issue every year after the last day of February.*

FORM IV

[See Rule 8]

1.	Place of Publication	Lumbini Park (Mental Hospital) 115, Bediadanga Road, Calcutta-39.
2.	Periodicity of its publication	Quarterly
3.	Printer's Name Nationality Address	Dr. Tarun Chandra Sinha, D.Sc. Indian 67, Jatindas Road, Calcutta-29
4.	Publisher's Name Nationality Address	Dr. Tarun Chandra Sinha, D.Sc. Indian 67, Jatindas Road, Calcutta-29
5.	Editor's Name Nationality Address	Dr. Suhrit Chandra Mitra, M.A., Ph.D. Indian 12, Hindusthan Road, Calcutta-29
6.	Names and addresses of individuals who own the newspaper and partners or shareholders holding more than one per cent of the total capital.	Indian Psychoanalytical Society 14, Parsibagan Lane, Calcutta-9

I, Tarun Chandra Sinha, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief,

Date, 2nd May, 1961

TARUN CHANDRA SINHA
Signature of Publisher